মহিলা করোনায় আক্রান্ত হয়ে আইসিইউ তে ভর্তি হয়েছে। মহিলার অবস্থা সংকটজনক। লাইফ সাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছে। এর দু'দিন পর ঐ মহিলার ছেলে করোনায় আক্রান্ত হলে তাকেও ঐ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছেলের অবস্থা দেখে ডাক্তারগণ তাকেও আইসিইউতে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। কিন্তু আইসিইউতে কোন বেড খালি নাই। তখন হাসপাতালের ডাক্তারগণ রোগীর সাথে যারা আছেন তাদেরকে বলেন, দেখুন রোগীর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে একে আইসিইউ তে ভর্তি করতে না পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবেনা। হাসপাতালের ডাক্তারদের কথায় রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা নিরুপায় হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ছেলের মাকে আইসিইউ থেকে বের করে তার জায়গায় তার ছেলেকে রাখার জন্য। কেননা পাঁচ সদস্যের ঐ পরিবারে এই ছেলেই একমাত্র উর্পাজনশীল ব্যক্তি। অভিজিতের কথা শুনে ডেভিড জিজ্ঞাসা করে সত্যই তার মাকে আইসিইউ থেকে বের করে বাইরে রাখলো? হ্যাঁ খবরে তো তাই বলল। মাকে বের করে বাইরে বারান্দায় এক কোণে রাখে। পরদিন মা মারা যায়। শুধু তাই নয় খবরে আরও বলল, আইসিইউ তে ছেলের অবস্থাও আশঙ্কা জনক। ঘরের ভেতর থেকে সন্ধ্যা বেরিয়ে এসে হাতের মোবইলটা ডেভিডকে দিয়ে বলে, তোমরা কি ঘুমাবে না? নাকি রাতভর দু'বন্ধু শুধু গল্পই করবে? সকাল হতে বেশী সময় বাকী নাই। সন্ধ্যার কথায় দু'বন্ধু উঠে বিছানায় যায়।

ঢাকা থেকে ফিরে অভিজিত খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্কুলে মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেবার জোর প্রস্তুতি চলছে। বাড়িতে সুনীতিকেও কিছুটা সময় দিতে হয় আবার মেয়ের সংসারের খোঁজ খবর রাখতে হয় এই সব কিছু নিয়ে অভিজিত ব্যস্তই আছে। অভিজিত আর সুনীতির সংসারে একমাত্র কন্যা সন্তান শ্রাবন্তী। বিএ পাশ করার পর মেয়েটাকে ভাল একটা পাত্রের সাথে বিয়ে দেয় অভিজিত। নিজে যেমন শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তেমনি মেয়ে শ্রাবন্তীকেও একজন শিক্ষকের হাতে তুলে দিয়েছে। অভিজিত ভুল করেনি। শিশিরের বাবাও একজন শিক্ষক ছিলেন। শিশির উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শিশিরের বাবা মারা যায়। বাবার মৃত্যুর পর স্কুলকর্তৃপক্ষ শিশিরকে তার বাবার জায়গায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন। শিক্ষকতা করতে করতেই শিশির বিএ পাশ করে তারপর বিএডও নিয়ে নেয়। পাঁচ বছর শিক্ষকতা করে শিশির শিক্ষক হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দেয়। স্ত্রী শ্রাবন্তীর পরামর্শে নিজ বাড়ীতে টিউটোরিয়াল খোলে "শিশির টিউটোরিয়াল" নামে। শিশুশ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। ধীরে ধীরে সেই টিউটোরিয়াল আদর্শ একটি টিউটোরিয়াল হিসাবে গড়ে ওঠে। অভিজিত মেয়ে ও মেয়েজামাইকে নিয়ে গর্ভ বোধ করে।

স্কুলের রিহাসেল শেষে ইছামতি নদীর উপর দিয়ে যে বিশাল ব্রীজ দেওয়া হয়েছে সেই ব্রিজ দিয়ে বাড়ীতে ফেরার পথে সুনীতি অভিজিতকে জিজ্ঞাসা করলো, ঢাকা থেকে এসেছ প্রায় এক সাপ্তাহ হলো এর মধ্যে ডেভিডদার কোন ফোন পেয়েছ? বিশালদা কেমন আছে তা কি জানা গেল? অভিজিত সুনীতির কথা শুনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে। সুনীতিকে হাত ধরে ওভার ব্রীজের এক পাশে নিয়ে অভিজিত বলে, তুমি ভাল কথা মনে করেছ, আমি একদম ভুলে গেছি। পরশু দিন রিহাসেলের সময় ডেভিড আমাকে ফোন করেছিল। কি বলেছিল ফোনে? সুনীতি জানতে চায়। অভিজিত বলল ডেভিড বলেছিল বিশালের করোনা নেগেটিভ পেয়েছে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বিশালের মেয়ে রহিনী ওকে বাসায় নিয়ে গেছে। যাক বাবা বাঁচা গেল। তুমি একটা ভাল খবর শুনালে।

অভিজিত আর সুনীতি অনেকক্ষণ ওভার ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে আর পূবদিকের আকাশটা সেই অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে আলোয় উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে। মনে হয় আজই পূর্ণিমা। অনেকক্ষণ দু'জনে ওভার ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে রইলো। অসংখ্য লোকজন যাওয়া আসা করছে এই ওভার ব্রীজের উপর দিয়ে। রিক্সা, ইজিবাইক, ভ্যানগাড়ী অনেক রাত পর্যন্ত চলাচল করে। ব্রীজটা হওয়ায় শিকারীপাড়া, সোনাবাজু আর জয়কৃষ্ণপুর এমন কি শংকরদিয়া পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সহজ হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অভিজিত আর সুনীতি বাড়ীর দিকে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে অভিজিত বলল, জানো সুনীতি আমার মনে হয় স্কুলের প্রগ্রামে আমাদের পরিশ্রম বৃথাই যাবে। অভিজিতের কথা শুনে সুনীতি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে। কাধের ব্যাগটা থেকে পানির বোতলটা বের করে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে বলে, কি বলছো তুমি আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে কেন? অভিজিত শান্ত গলায় বলে, করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন এর আক্রমনের পর দেখা দিল ব্লাক ফাঙ্গাস এর সাথে লড়াই করতে করতে সাড়াদেশ যখন ভয়ংকর একটা পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে ঠিক সেই সময় দেখা দিল করোনার ভেল্টা ভেরিয়েন্ট। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার সারাদেশে লক ডাউন দিচ্ছে আবার তুলে নিচ্ছে। কি করবে সরকারও বুঝে উঠতে পারছেনা। এই রকম অবস্থায় মন্ত্রীমহোদয়ও অনুষ্ঠানে আসবে বলে মনে হয়না। অভিজিতের কথা শুনে সুনীতি বলল, এটা হতেই পারে। ধরে নাও তোমার স্কুলের এ অনুষ্ঠান হচ্ছেনা। তা না হোক তবুও দেশের এই ভয়ংকর পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠুক এটাই আশা করি। সুনীতি বলল, চল তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়ে আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা করি। অভিজিত বলল, হ্যাঁ এটাই আমাদের এখন প্রধান কাজ। যে কাজটি দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসছি এ ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। সন্ধ্যাকালিন প্রার্থনা শেষ করে অভিজিত টেলিভিশনের সামনে বসে খবর দেখতে থাকে। সুনীতি রাতের খাবারের জন্য রুটি বানাতে যায়। রাতের বেলা দু'টো করে আটার রুটি দীর্ঘদিন যাবৎ খেয়ে আসছে। এতে শরীরটা হালকা থাকে। রাতে রুটি খেতে খেতে এখন অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেছে। কোন দিন রাতেরবেলা রুটির পরিবর্তে ভাত খেলে শরীর ভারি হয়ে যায়, অস্বস্থি লাগে। আজকে রাতে খাবারের মেনু ভালই আছে। মাছের ডিম দিয়ে কাকরল ভাজি আর পাতলা মুগ ডাল। পরিতৃপ্তির খাওয়া। খাবার শেষে সুনীতি বলল, আগামীকাল শুক্রবার স্কুল অফিস সব কিছু বন্ধ, তাছাড়া লক ডাউনের কারণে স্কুলতো এমনি বন্ধ আছে। চল, কাল সকালে আমরা শ্রাবন্তীদের বাড়ীতে যাই। অনেকদিন ওদের দেখিনা ওদের সাথে কথা হয়না। অভিজিত বলল, বেশতো ওদের একটা ফোন করে দাও আমরা কাল দুপুরে আসছি।

গ্রাম অঞ্চলে এখনও রাত অনেক বড় হয়। যদিও এখন ঘরে ঘরে বিজলী বাতির আলো জ্বালিয়ে শহরের অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে গ্রামের মানুষ। তথাপি গ্রাম গ্রামই। এখনও গ্রামের মানুষ সারাদিন পরিশ্রমের পর পুজাপাঠ আর মসজিতে গিয়ে নামাজ আদায় করে রাতের আহার সেরে বিছানায় যায় রাত ১০টা থেকে ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে। সেখানে শহরের মানুষ ১১টা ১২টায় রাতের খাবার খেয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে আবার মোবাইলে ফেইজবুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরে। শহরের বেশীরভাগ মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক রাত ২টা ৩টা পর্যন্ত জেগে থাকে। গ্রামের মানুষের কাছে রাত ২টা ৩টা গভীর রাত। বেশীর ভাগ গ্রামের মানুষ এই নিঝুম রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। অভিজিতও এর ব্যতিক্রম নয়। অভিজিতের মোবাইটা বেজেই চলছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অভিজিত জানতেই পারেনা। মোবাইলটা তিন চার বার বাজার পর অভিজিতের পাশে শুয়ে থাকা তার স্ত্রী সুনীতি জেগে ওঠে। মোবাইলটা অভিজিতের ডান পাশে থাকায় সুনীতি অভিজিতকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। অভিজিত বিছানা থেকে ওঠে মোবাইলটা ধরে। হ্যালো বলতেই অন্য প্রান্ত থেকে ডেভিডের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ডেভিড বলছে, ভাই অভিজিত বড় একটা দুঃসংবাদ আছে। কিসের দুঃসংবাদ? অভিজিত চমকে উঠে। অভিজিতের পাশে থাকা সুনীতি দ্রুত পালং থেকে নেমে ঘরের লাইট জ্বালিয়ে

দেয়। ডেভিড বলল, কিছুক্ষণ আগে চট্টগ্রাম থেকে রহিনী ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, কাকু বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। বাবা নেই। বিশাল নেই একথা কিভাবে মেনে নেব বলতে বলতে ডেভিডের গলার স্বর বুজে আসে। অভিজিত কিছু বলার আগেই সুনীতি ডুকরে কেঁদে উঠে। অভিজিত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ডেভিডকে জিজ্ঞেসা করে বিশালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোথায় হবে চট্টগ্রামেই নাকি ওদের নিজ গ্রাম শুলপুরে? ডেভিড বলল, আগামীকাল সকালে ফোন করে জানবো। ঠিক আছে তুমি আমাকে জানিও।

অভিজিত বিছানা থেকে নেমে টেবিলের উপর রাখা পানির মগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে নিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসে। সুনীতি মশারিটা খুলে বিছানার পাশে গুছিয়ে রাখে। অভিজিত জিজ্ঞাসা করে ক'টা বাজলো? সুনীতি বলল সকাল হয়ে আসছে, পৌনে ৫টা। অভিজিত বলল, একটু চা কর আদা আর তুলশীপাতা দিয়ে বলেই হাতের গ্লাস থেকে পানি খেয়ে ওয়াশ রুমে যায়, হাত মুখ ধুয়ে এসে চেয়ারটায় বসে থাকে। সুনীতিও হাত মুখ ধুয়ে এসে আদা, তেজপাতা, লং, দারুচিনি আর তুলশী পাতা দিয়ে চা করে আনে। চা খেতে খেতে সুনীতি বলল, একটা কথা তোমাকে বলিনি। অভিজিত বলল, কি কথা? কাল আমরা শ্রাবন্তীদের বাড়ী গিয়ে সারাদিন থেকে এসেছি শ্রাবন্তী আমাকে একটা কথা বলেছিল তখন আমি কথাটা তেমন গুরুত্ব দেইনি কিন্তু এখন আমার খুব চিন্তা লাগছে। অভিজিত বলে কি কথা? সুনীতি বলল, শ্রাবন্তী বলেছিল ওদের পেছনের বাড়ীতে দুইজনের করোনা হয়েছে কিন্তু প্রকাশ করেনি। সুনীতির কথা শুনে অভিজিত বলল, এটাতো খুব বিপদের কথা। তুমি শ্রাবন্তীকে সাবধান করে আসনি? ওদের পেছনের বাড়ীতে কেউ যেন আসা যাওয়া না করে। এভাবে আরও কত বাড়ীতে কত জনের করোনা হয়েছে কে জানে। কি ভয়ংকর পরিস্থিতি আমাদের চার পাশে ছড়িয়ে পড়ল। বাইবেলের বাণীগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নবীদের বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে। বাইবেলটা খুলে দেখতো সামসঙ্গীত ৯১ তে কি লেখা আছে। সুনীতি বিছানার মাথার কাছে রাখা বাইবেলটা নিয়ে ৭৯৮ পৃষ্ঠা খুলে তারপর সাম সঙ্গীত ৯১ এর ৭ পদের লেখা পড়তে থাকে।

লুটিয়ে পড়বে সহস্রজন তোমার পাশে
দশ সহস্রজন তোমার ডান দিকে
তোমার কাছে তবুও কিছুই আসবেনা।
তুমি এখনি চোখ মেলেই তাকাও
তখন দেখবেই তুমি দুর্জনদের শাস্তি
স্বয়ং প্রভুই তোমার আশ্রয় ..... ।

অভিজিত সুনীতিকে থামিয়ে দিয়ে বলে, সুনীতি আমরা কি এই অবস্থায় আছি? সুনীতি বলে, জানিনা, আমরা কি অবস্থায় আছি তবে বিশ্বাস করি স্বয়ং প্রভুই আমাদের সহায়।

সকাল ১০ টার পর ডেভিডের ফোন আসে অভিজিতের কাছে। ডেভিড বলল, আগামী পরশু বিশালের ডেডবডি ঢাকায় আনবে। ঐদিন বারডেমে রাখার ব্যবস্থা করেছে। পরদিন বুধবার সকালে শুলপুর ওর নিজ বাড়িতে নেবে এবং ঐদিনই দুপুর ১২টায় শুলপুর কবরস্থানে ওর সমাধি হবে। অভিজিত জানতে চাইলো বিশালের মৃতদেহের সাথে ওর পরিবার থেকে কে কে আসছে? ডেভিড বলল, খুব সম্ভবত বিশালের মেয়ে রহিনী এবং ওর স্বামী জাকারিয়া আসবে। তুমি তাহলে ঢাকায় কবে আসছ? অভিজিত বলল, আমি ঢাকায় যাবনা। আমি আর সুনীতি বুধবার সকালে আমাদের এখান থেকে সিএনজি নিয়ে সরাসরি শুলপুর চলে যাব। ওখানেই তোমাদের সাথে দেখা হবে। ডিভিড বলল, ঠিক আছে।

বুধবার সকালেই অভিজিত আর সুনীতি একটা সিএনজি ভাড়া করে শুলপুর রওনা হয়। ঢাকা থেকে ডেভিড আর সন্ধ্যা ওরাও সিএনজি নিয়ে পৌঁছায় শুলপুর। প্রায় ১১টার মধ্যেই লাশ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ঢাকা থেকে এসে পৌঁছায়। শুলপুর, মজিদপুর গ্রামের মানুষ এবং আশে পাশের হিন্দু ও মুসলিম সমাজের শত শত মানুষ লক ডাউন শিথিল হওয়ায় বিশালের শেষকৃত অনুষ্ঠানে বিশালকে শ্রদ্ধা জানাতে আসে। মানুষের ভীড় ঠেলে অনেক কষ্টে বিশালের কফিনের পাশে এসে দাঁড়ায় ডেভিড, সন্ধ্যা, অভিজিত ও সুনীতি।

অভিজিত আর ডেভিড বিশালের মাথার পাশে বসে অশ্রুভরা নয়নে শেষ বিদায় জানায় প্রিয় বন্ধুকে। সন্ধ্যা আর সুনীতি বিশালের পায়ের কাছে বসে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। বিশালের বুকের উপর হাত রেখে বিশালের মেয়ে রহিনী শুধু কেঁদেই চলছে। মা, বাবা আর নিকট আত্মীয়স্বজন কেহই রইলো না রহিনীর জীবনে। বিশালের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ডেভিড আর অভিজিত ওরা ফিরে যায়।

বিশালের মৃত্যুতে ডেভিড মানসিক দিক থেকে ভীষণ ভাবে ভেঙ্গে পরে। নিজেকে খুব অসহায় আর দুর্বল মনে হতে থাকে। ঢাকায় পৌঁছে রাতেই আমেরিকা ফোন করে কথা বলে ছেলে প্রশান্তের সাথে। বিশালের মৃত্যুর কথা ছেলেকে জানায়। বিশালের মৃত্যুসংবাদ শুনে খুব দুঃখ করল প্রশান্ত। বাবাকে বলল, তুমি খুব সাবধানে থেকো বাবা। ঘরের বাহিরে কোথাও যেওনা। মুখে মাস্ক ব্যবহার করো। ডেভিড বলল, আমার মনটা খুব উতালা হয়ে উঠেছে। তোরা সবাই চলে আয় বাংলাদেশে। তোদের দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। প্রশান্ত বলল, বাবা আমরা তো সামনের বড়দিনের আগে আসবো এটা আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েই আছে। বড়দিন আসতে মাত্র ৩ মাস বাকী। তোমরা প্রস্তুত থাক সবাই মিলে বড়দিন করে তোমাদের নিয়েই আমেরিকায় ফিরবো।

শুলপুর থেকে ফেরার পর অভিজিতের মনটা বড়ই বিক্ষিপ্ত হয়ে পরেছে। কোন কাজে মন বসাতে পারে না। করোনায় সারা দেশে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। টিকা দেওয়ার পরও মানুষের মৃত্যুর হার কমছে না। ধীরে ধীরে এই মহামারি শহর থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাবা বসাচ্ছে। গ্রামের মানুষ সাবধানতো নয়ই তার পর অনেকেই আক্রান্তের কথা গোপন রাখে। যার ফলে নিজের অজান্তেই একে অপরের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ২৪ ঘন্টায় গতকাল যেখানে ছিল ২৪০ জন আজ সকালে খবরে বলছে ২৬০ জন মারা গেছে। এর পর কি হবে কে জানে।

আজ ২ দিন থেকে ডেভিডের শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে। গায়ে জ্বর, গলায় ব্যাথা মাঝে মাঝে নাক বন্ধ হয়ে আসে। সন্ধ্যা সর্বক্ষণিক ডেভিডের পাশে থেকে ওর সেবাযত্ন করছে। প্রতি ঘন্টায় জ্বর পরীক্ষা করছে। লেবুর রস, আদার রস, লং, দারুচিনি সবমিলিয়ে পানিতে অনেকখন ফুটিয়ে কিছুক্ষণ পর পর ডেভিডকে খাওয়াচ্ছে। জ্বর কিছুতেই কম না হওয়ায় শমরিতা হাসপাতালে সন্ধ্যার মামাতো ভাই ডাক্তার জুয়েলকে ফোন করে। ডাক্তার জুয়েল বলল, জ্বর আর শরীর ব্যাথা ৩ দিনের মধ্যে না কমলে হাসপাতালে নিয়ে এসো।

পরদিন সকালে ডেভিডকে শমরিতা হাসপাতালে নিয়ে যায় সন্ধ্যা। ডাক্তার জুয়েল ডেভিডকে পরীক্ষা করে ভর্তি করে নেয়। সন্ধ্যাকে বলে তুমি বাসায় যাও। ভয়ের কিছু নেই। যা কিছু প্রয়োজন হবে আমি সব ব্যবস্থা করবো।

সন্ধ্যা হাসপাতাল থেকে বাসায় এসে ছেলে প্রশান্তকে ফোন করে সব কিছু জানায়। প্রশান্ত বাবার অসুস্থতা আর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে একেবারে ভেঙ্গে পরে। কিন্তু মাকে তা বুঝতে দেয়না। ফোনে বলে মা তুমি বাবার জন্য দুশ্চিন্তা করোনা। বাবা ভাল হয়ে যাবে। বাবার তো করোনার টিকা দেওয়া আছে ভয়ের কিছু নেই। বাবা কখন কি রকম থাকে আমাকে জানাবে।

সন্ধ্যা বাসায় একা। ডেভিড হাসপাতালে। কাজের মেয়েটা ৩ দিন যাবৎ ওর বাড়িতে গেছে এখনও ফিরে আসেনি। আজ একাই সন্ধ্যাকালিন প্রার্থনা করে মোবাইলটা নিয়ে সুনীতিকে ফোন দেয়। সুনীতি অনেকদিন পর সন্ধ্যার ফোন পেয়ে খুব খুশী হয় ফোনে জিজ্ঞাস

করে, কেমন আছিস সন্ধ্যা? ডেভিডদা ভাল আছে তো? সন্ধ্যা ধরা গলায় বলল, না ভাল নাই। সুনীতি জিজ্ঞেস করে কেন? কি হয়েছে? সন্ধ্যা ডেভিডের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরে। সুনীতি কম্পিত কণ্ঠে বলল, কি হয়েছে বলবি তো? সন্ধ্যা বলল, ডেভিড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ওর করোনা হয়েছে। বলিস কি? কোন হাসপাতালে? সন্ধ্যা বলল, শমরিতায়। আমার মামাতো ভাই ডাক্তার জুয়েল শমরিতা হাসপাতালে কাজ করে ওর সাথে যোগাযোগ করে ওরই চেষ্টায় শমরিতায় ভর্তি করতে পেরেছি। অভিজিতদা কি ঘরে নেই? সুনীতি বলল, না অভিজিত দোকানে গেছে মশার কয়েল আনতে। সন্ধ্যা বলল, অভিজিতদাকে বলিস আর তোরা ডেভিডের জন্য প্রার্থনা করিস। ডেভিড যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাসায় আসে। সুনীতি বলল, সন্ধ্যা তুই একদম চিন্তা করিসনা অভিজিত বাসায় এলেই আমরা প্রার্থনায় বসবো। ডেভিডদার জন্য প্রার্থনা করবো। তুই দেখিস ডেভিডদা তাড়াতাড়ি সুস্থ্য হয়ে বাসায় ফিরে আসবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

অভিজিত ঘরে ফিরে সুনীতির কাছে জানতে পারল ডেভিডের কথা সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকে ফোন করে অভিজিত কিন্তু ফোন কিছুতেই ঢুকছেনা, পর পর ৩ বার ফোন করলো প্রতিবারই বিজি বলছে। অভিজিত ঘরের ভেতরে একা একা পায়চারি করতে থাকে। সুনীতি অভিজিতের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বলে, আমি একবার আমার মোবাইলে চেষ্টা করে দেখি সন্ধ্যাকে পাই কি না। সুনীতির ফোনও ঢুকলোনা শেষে সুনীতি অভিজিতকে বলল, এসো আমাদের প্রার্থনা করি। প্রার্থনার শেষে আবার চেষ্টা করবো।

প্রার্থনার শেষে সুনীতি আবার ফোন করে সন্ধ্যাকে। ফোন বাজতে বাজতে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার ফোন করে এবার অন্যপ্রান্ত থেকে হ্যালো বলতেই সুনীতি বলে ওঠে কে সন্ধ্যা? কি ব্যাপার এত ফোন করছি ফোন ধরছিস না কেন? সন্ধ্যা বলে, একটু আগে আমেরিকা থেকে প্রশান্ত ফোন করেছিল। ওর সাথে অনেকখন কথা বলেছি। অভিজিত সুনীতিকে বলে, তোমার মোবাইলের স্পীকার অন্ করে দাও আমিও কথা শুনতে পাব। সুনীতি স্পীকার অন্ করে দিয়ে বলে ডেভিডদা কেমন আছে? না, ডেভিডের অবস্থা ভালনা। বিকালে ডাক্তার জুয়েল আমাকে বলেছে ডেভিডের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হওয়ায় ওকে আইসিইউতে ভর্তি করা জরুরী হয়ে পরে, কিন্তু আইসিইউতে কোন বেড খালি নেই। ডাক্তার জুয়েল তার অফিস রুমের এক পাশে আইসিইউর সব রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা করে ডেভিডের চিকিৎসা চালাচ্ছে।

অভিজিত বলে ওঠে, সন্ধ্যা তুমি ভয় পেয়োনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। ডেভিডের করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া আছে ওর কিছু হবেনা। অভিজিতদা, আমি এখন কি করবো? আমার কি হবে? বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পরে সন্ধ্যা। অভিজিত সন্ধ্যাকে কি বলে সান্তনা দেবে বুঝতে পারেনা। অভিজিতের মনে হয়, ও বুকের ভেতরটা ফেঁটে যেতে চাইছে। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলে, ঈশ্বরে ভরসা রাখ। আমরা ডেভিডের জন্য প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর ওকে সুস্থ্য করবেনই। লক ডাউন না থাকলে এখনই আমরা চলে আসতাম। অভিজিতের কথা শুনে সন্ধ্যা বলল, লক ডাউন উঠে না গেলে তোমরা এসোনা। আমি ডেভিডের অবস্থার কথা তোমাদের জানাবো। অভিজিত বলল, ঠিক আছে তুমি হাসপাতালে গিয়ে আমাদের ফোন দিও।

গত ২৪ ঘন্টায় ডেভিডের কোন সংবাই পেলোনা অভিজিত। বার বার সন্ধ্যাকে ফোন করছে কখনও ফোন বাজে কেউ ধরেনা আবার কখনও ফোনে কল ঢোকেই না। সুনীতিও সন্ধ্যাকে ফোন করে করে দিশে হারা হয়ে পড়ে, এবার কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনা। লক ডাউনের জন্য ঢাকায় যাবার কোন উপায় নেই। অনেকক্ষন উভয়ে কোন কথা বলেনা। সুনীতি বিছানার এক পাশে বসে থাকে আর অভিজিত ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। এক সময় বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। সুনীতি উঠে ঘরে এবং বাইরের সব বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে অভিজিতকে বলে এসো আমরা সন্ধ্যা প্রার্থনা করি। প্রার্থনার পর আবার ফোন করা যাবে।

অভিজিত আর সুনীতি প্রার্থনায় বসে যায়। আজকের প্রার্থনা ডেভিডের সুস্থ্যতার জন্য। অনেকক্ষন ধরে প্রার্থনা করে। প্রার্থনার শেষে অভিজিত সুনীতিকে বলে, তোমার মোবাইল থেকে ফোন কর। সুনীতি সন্ধ্যাকে ফোন করে কিন্তু ফোন ধরেনা। দ্বিতীয়বার ফোন করল কিন্তু কল ঢুকলই না। এবার অভিজিত বলল, দাঁড়াও আমি একবার চেষ্টা করি। অভিজিত ওর মোবাইল থেকে সন্ধ্যাকে ফোন করল, ফোন বাজলো, কিন্তু কেউ ফোন ধরলনা। অভিজিত আবার চেষ্টা করে এবার ফোন রিং হতেই কে যেন পুরুষ কণ্ঠে বলল, হ্যালো কে? অভিজিত বলল, সন্ধ্যা আছে? অন্য প্রান্ত থেকে বলে আপনি কে? অভিজিত বলল, আমি অভিজিত, ডেভিডের বন্ধু। আপনি? আমি ডাক্তার জুয়েল সন্ধ্যার মামাতো ভাই। অভিজিত বলল, নমস্কার। প্রতি উত্তরে ডাক্তার জুয়েল বলল, নমস্কার। অভিজিত জানতে চাইলো ডেভিডের অবস্থা কেমন? ডাক্তার জুয়েল কয়েক মুহূর্ত নিরব থেকে বলল, ডেভিডদাকে বাঁচাতে পারিনি। বলেন কি? অভিজিতের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠে। আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ডেভিডদা চলে গেল। ডেভিডদার মৃত্যুতে সন্ধ্যা এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়ল যে ওকে নিয়েও বিপদে পড়েছিলাম। এমনিতে সন্ধ্যার শরীর খুব দুর্বল ছিল তার উপর হঠাৎ পরে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এখন বাসায় নিয়ে এসেছি একটা ইনজেক্শন দিয়েছি এখন ঘুমাচ্ছে। ডেভিডের মৃত্যু কখন কোন সময় হয়েছে? অভিজিত জানতে চায়। ডাক্তার জুয়েল বলল, গতকাল বিকাল ৪ টায়। ডেভিডের লাশ কি এখনও শমরিতা হাসপাতালেই আছে? ডাক্তার জুয়েল বলল, না বারডেম হাসপাতালে রাখা হয়েছে। ডেভিডদার ছেলে প্রশান্তের সাথে ফোনে কথা হয়েছে ওরা বাংলাদেশে আসার পর ডেভিডদার শেষকৃত অনুষ্ঠান হবে। অভিজিত কম্পিত কণ্ঠে বলল, ডেভিডের শেষকৃত অনুষ্ঠানের আগে আমাকে জানাবেন। আমরা আসবো। ডাক্তার জুয়েল বলল, অবশ্যই জানাব।

অভিজিত হাতের মোবাইলটা বন্ধ করে পেছনে তাকিয়ে দেখে সুনীতি বিছানায় উবুর হয়ে কাঁদছে। অভিজিত সুনীতিকে আর কিছু বললনা। শুধু মনে মনে বলল, সুনীতি তুমি কেঁদে কেঁদে বুক হালকা করছ আর আমিতো কাঁদতেও পারছিনা, আমার মনে হচ্ছে কে যেন আমার কণ্ঠ চেপে ধরে আছে। আমার যন্ত্রণা আমার বুকের ভেতর গুমরে মরছে।

অনেক রাতে হঠাৎ করে অভিজিত ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে। ওর পাশে শুয়ে থাকা সুনীতি জেগে ওঠে জিজ্ঞাস করে, কি হলো তুমি চিৎকার করে উঠলে কেন? অভিজিত হাফাতে হাফাতে বলে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। কি দুঃস্বপ্ন দেখছিলে? বলতে বলতে অভিজিতের বুকে মুখ রেখে সুনীতি অভিজিতকে জড়িয়ে ধরে। অভিজিত চমকে উঠে বলে, একি তোমার শরীর এত গরম কেন? তোমার তো জ্বর হয়েছে। সুনীতি বলল, গতকাল বিকাল থেকে একটু জ্বর জ্বর আর গলা ব্যাথা হচ্ছিল। অভিজিত বলল, দু'দিন যাবৎ তোমার জ্বর আর গলা ব্যাথা আমাকে বলনি কেন? তোমার অবস্থা দেখে তোমাকে বলতে সাহস পাইনি। আমাদের আবার অবস্থা কি? আমাদের সব অবস্থা একটা একটা করে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কোভিড নাইনটিন তুমি একে একে আমার দুই বন্ধুকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছ, এখন আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়েছ? না না আমার সুনীতিকে তোমায় নিয়ে যেতে দেব না, না না কিছুতেই না, কিছুতেই না বলতে বলতে সমস্ত শক্তি দিয়ে সুনীতিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ...॥

# হবু শ্বশুড়ের বাড়ি

**শিউলী রোজলীন পালমা**

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করেই যেন ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল নিখিলের পরিবারে অর্থাৎ নিখিল গমেজের মেয়ে ক্ষমার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়ুয়া মেয়ে ক্ষমা, অনার্স ফাইনাল ইয়ারেই বিয়েতে মত দিবে এটা হজম করতে নিখিলের কষ্ট হচ্ছে। নিখিলের তো স্বপ্ন ছিল তার দুই মেয়ে ক্ষমা ও প্রমা অনার্স মাস্টার্স শেষ করে এমফিল বা পিএইচডি- এর পথ বাতলে তারপর বিয়ে নিয়ে ভাববে। কিন্তু তার স্বপ্ন উলটপালট হয়ে যাচ্ছে, ঝড়ে পড়লে যা হয়।

ক্ষমার মেসোতো বোন উপমার বিয়েতে ক্ষমার মিষ্টি চেহারা, অমায়িক ব্যবহার দেখে ও বুদ্ধিমত্তার কথা জেনে সেই যে পেছন লেগেছিল দিব্যর মা আর ছাড়েনি। কারণে-অকারণে উপহার পাঠিয়ে, খাবার পাঠিয়ে ক্ষমা ও ক্ষমার মাকে একদম কাবু করে ফেলেছে। ক্ষমার মায়ের কথা হল দিব্যর বাবা ব্যবসায়ী, ওরা বড়লোক, এটা ওদের দোষ না, দিব্য ভাল ছেলে, আজ পর্যন্ত কেউ ওর সম্পর্কে একটি খারাপ কথাতো বলেইনি বরং সবাই ওর নম্রতা ও ভদ্রতার প্রশংসাই করেছে। দিব্য নর্থ সাউদ ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ করে লন্ডনের ম্যানচেস্টার ইউনির্ভাসিটি থেকে এমবিএ শেষ করে দেশে ফিরেছে। দিব্যর বাবা অবশ্য বারবার বলেছে দেশে বিবিএ করানোটা তার ভুল সিদ্ধান্ত ছিল, এ লেভেল করার পরই বাইরে পাঠানো দরকার ছিল।

দিব্যর বাবা বাঁধন পেরেস একজন ব্যবসায়ী। এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ও শিপিং- এর ব্যবসা। এই ব্যবসা থেকে অল্প সময়েই প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছেন। ঢাকার রাজাবাজারে একটি চারতলা বাড়ি, মিরপুরে দু'টি ও বনানীতে একটি ফ্ল্যাট। স্ত্রী সন্তানদের ব্যবহারের জন্য রয়েছে দু'টো গাড়ি। তুমিলিয়া, ভাদুন ও মঠবাড়িতে রয়েছে প্রচুর ধানী জমি, পুকুর ও উঁচু চালা জমি। ঢাকার কলাবাগানে সুসজ্জিত বিশাল অফিস, চার ড্রাইভারসহ মোট স্টাফ ১৯ জন। অফিস পরিচালনায় মাসিক ব্যয় হয় ১৫ লাখ টাকা।

দিব্যদের তুলনায় ক্ষমাদের জীবন একদম সাদামাটা। সীমিত আয়ের পরিমিত খরচের জীবন। ক্ষমার বাবা নিখিল কস্তা ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ হতে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করেই একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থায় চাকুরী শুরু করেছে এবং প্রায় ২০ বছর যাবৎ একই সংস্থায় কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের অধিকার, উন্নয়ন, মর্যাদা, ইত্যাদিই তার ধ্যান জ্ঞান। পেশাগত জীবনে চরম একনিষ্ঠ। কারো সাতেপাঁচে নেই, অল্পে তুষ্ট মানুষ। ব্যবসার কিছুই সে বোঝে না। দিব্যর বাবার ব্যবসা সম্পর্কে নিখিল অনেক কিছু বুঝতে চেয়েছে, উনিও অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু নিখিল পরিষ্কার করে কিছুই বুঝতে পারেনি। তাইতো মনে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়েই এই বিয়ের পরিকল্পনাটা এগিয়ে নিতে হয়েছে। মেয়ে, মেয়ের মায়ের মতামতকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না।

এই বিয়ের প্রতিটি ধাপেই ক্ষমা ও ক্ষমার পরিবার বিস্মিত হয়েছে। প্রথমবার যখন আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমাকে দিব্যর পরিবার দেখতে এলো সেইদিনই দিব্যর মা লাখ টাকার ডায়মন্ডের আংটি পরিয়ে ক্ষমাকে আশীর্বাদ করল, আগত ছোট-বড় ১৩ জন অতিথি ক্ষমার হাতে লাল, নীল, বেগুনী, হলুদ রঙের সুন্দর সুন্দর খাম ধরিয়ে দিয়ে গেল। এ খামগুলো খুলে তাদের চোখ কপালে উঠে গেছে, প্রতিটি খামে রয়েছে পাঁচ হাজার করে টাকা।

সামাজিক রীতি অনুযায়ী হবু বরের বাড়ি দেখতে যেদিন ক্ষমার পরিবার দিব্যদের বনানীর ফ্ল্যাটে গেল সেদিন ওরা বিস্ময়ে হতবিহ্বল। অনেক আত্মীয় স্বজনের ফ্ল্যাটই তো আগে দেখেছে কিন্তু এমন রাজপ্রাসাদ তো এর আগে দেখেনি। চার হাজার স্কয়ারফিটের এই ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে ছোট-বড় ড্রয়িং রুমই আছে তিনটি, ডাইনিং দু'টি, বেড, বাথ, এক্সারসাইজ রুম, সার্ভেন্ট কোয়ার্টার, ব্যালকনি সব মিলে একেবারে এলাহীকাণ্ড। দিব্যর বাবা উৎফুল্ল হয়ে বোঝালেন বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচারের ব্যাপারে তার কতো দুর্বলতা। কোন দেশ হতে কোন ফার্নিচার কীভাবে আনলেন তা-ও খুঁটিনাটিসহ বললেন। দিব্যর মাও এক ফাঁকে বললেন, 'আপনার বেয়াইয়ের নজর ফার্নিচারের দিকে হলেও আমার নজর কিন্তু পর্দার দিকে। বাড়ির সব পর্দা আমার পছন্দে কেনা। আমরা যখন দেশের বাইরে যাই তখন আপনার বেয়াই শুধু দেখে ফার্নিচার আর আমি দেখি পর্দা।

ক্ষমার বাবা মা নতুন বেয়াই বেয়াইনের রুচির প্রশংসা করতে করতে ক্লান্ত তবুও যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল এতসব লাক্সারিয়াস জিনিসের প্রশংসা তারা ঠিক মতোন করতে পারছেন না।

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত নিখিলের চোখে ঘুম এলেও ক্ষমার মা চৈতালির চোখে ঘুম নেই। দিব্যদের বাড়ির ঘটনাবলীই সারাক্ষণ তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সে নিখিলকে ধাক্কা দিয়ে বলে, "বলতো দিব্যদের বাসার ১৪/১৫ বছরের মেয়েটার কাজ কী?

- ঘরটর ঝাড়ু দেয় বোধ হয়।
- আরে না, ঘর ঝাড়ু দেয়া কাপড় কাচা এসব কাজ করে ঐ মোটা মতন মেয়েটা, আর রান্না করে ফর্সা একজন মহিলা উনি।
- তাহলে মেয়েটা কী করে?
- ওর একটাই কাজ, সেটা হল পাতা মোছা। ও বাড়ির ব্যালকনিতে, ঘরে, প্যাসেজে যত গাছ আছে সব গাছের পাতা মুছে ও পরিষ্কার রাখে।
- এজন্যই সবকিছু ঝকঝকে পরিষ্কার কোথাও কোন ধুলো নেই।

চৈতালীর মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁধন বলে, এবার ঘুমাও তো।

- কিন্তু আমিতো ঘুমাতেই পারছিনা। ক্ষমার বেড রুমটা দেখেছ কি সুন্দর করে সাজিয়েছে, সব ফার্নিচারই নতুন। ওয়্যারড্রোবের উপর রাখা ঘোড়াটা আর ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা ফটোষ্ট্যান্ডটা কত সুন্দর! বাথরুমের বেসিন, কমোড সবই কিন্তু নতুন।
- তাই নাকি?
- হ্যাঁ, দেখনি কমোডের ঢাকনাটা এখনও স্কচটেপ দিয়ে লাগানো। বেয়াইন বলেছেন বিয়ের আগে কেউ এগুলো টাচ্ করবে না।

এভাবেই সবাইকে বিস্ময়মুগ্ধ করতে করতে শেষ হল দিব্য ও ক্ষমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত বাগদান, মেহেদী, হলুদ, বিয়ে, বৌ-আদর এবং হানিমুন।

পকেট থেকে ফোন বের করে চমকে উঠে নিখিল। ক্ষমার ১০টি মিস্ড কল। কি হল! ভয়ংকর কিছু! মাসখানেক যাবৎ নিখিল প্রতি

মুহূর্তেই আতঙ্কে থাকে কখন কী দুঃসংবাদ দেয় ক্ষমা। শ্বশুড় বাড়িতে নতুন পরিবেশে একটা মাস বেশ হাসি আনন্দেই কাটে ক্ষমার। একমাস পরেই এ বাড়ির আবহাওয়া পাল্টে যায়। কী একটা গোমট পরিবেশ। শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, দিব্য উদ্বিগ্ন হয়ে নীচু স্বরে কী যেন আলাপ করে। শ্বশুরের মেজাজ মর্জি অকারণেই হঠাৎ হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। শ্বশুর শ্বাশুড়ির টুকরো আলাপ মাঝে মাঝে তার কানে আসে। শ্বাশুড়ি বলে, "রাজাবাজারের বাড়ি বিক্রি করে দাও। মঠবাড়ির জমিরও দরকার নাই, এসব বিক্রি করে ওদের টাকা দিয়ে দাও।" শ্বশুর ক্ষেপে গিয়ে জবাব দেয়, "বিক্রি করা এত সহজ? না বুঝে কথা বল, ব্যাংকে মর্টগেজ দেয়া আছে অনেক কিছু।"

ক্ষমা বুঝে বড় ধরনের আর্থিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে এ পরিবারে। দিব্যর কাছে বিষয়টা জানতে চায়। দিব্য বলে, "আমিও বিষয়টা ভালমত জানি না, বাবা কোথায় কি করে আমাকে ঠিকমত বলে না।"

-কোথাও কী লোন আছে?

- হুঁ, ব্র্যাক ব্যাংকের কথা জানি।

- কত টাকা?

- ২৫ কোটি।

ক্ষমা ধপ্ করে বসে পড়ে। তার মাথা ভন ভন করে ঘোরে। বাসায় বাবার সেভিংসের খবরই সব সময় শুনেছে। বাবা কোথাও থেকে এক লাখ টাকা লোন করেছে তা কোনদিনই সে শুনেনি। দিব্য আবার বিড় বিড় করে বলে, "ব্যাংকের লোন নিয়ে সমস্যা নেই। এই ফ্ল্যাট বন্ধক রেখে বাইরের এক পার্টির কাছ থেকে লোন নেয়া হইছে, ওরাই ঝামেলা করতেছে।"

ক্ষমা শ্বশুর বাড়ির বিষয়ে তার মাকে কিছুই বলে না তবে বাবাকে গোপনে কিছুটা জানায়। মনের মধ্যে আশা যদি বাবা তার শ্বশুরকে কোন পথ দেখাতে পারে।

নিখিল ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করে বেয়াইয়ের কাছে ব্যাপারটা জানতে চায়:

-বেয়াই, আপনার ব্যবসা কেমন চলছে?

-ভা- ল - না। এদেশে ব্যবসা করা কঠিন। কয়েক কোটি টাকার বিল আটকে আছে। চিন্তায় রাতে ঘুম হয়না। নন্‌কমপ্লায়েন্সের অজুহাতে বেশ বড় একটা অর্ডার বাতিল হইছে। বড় অংকের ঘুষ ছাড়া তো কোন কাজই হয়না।

চিন্তায় ছেদ পড়ে নিখিলের, আবার রিং বেজে উঠে। ক্ষমার ফোন। ফোন ধরতেই কেঁদে উঠে ক্ষমা,

-বাবা কি হইছে ফোন ধরনা কেন?

-আমি তো মা আমার ধর্মমেয়ে রাত্রির হবু শ্বশুরের বাড়ি দেখতে আসছি। এতক্ষণ প্রার্থনায় ছিলাম তাই ফোন সাইলেন্সড ছিল। কি হইছে মা?

-বাবা আমাদের সব তছনছ হয়ে গেছে। বাসার সব কিছু টেনে হিঁচড়ে নীচে নামিয়ে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে দেয়া হয়েছে।

নির্বাক নিখিল কিছু বলার আগেই ক্ষমা বলে, "বাবা আমাদের যা হবার হয়েছে কিন্তু প্লিজ বাবা তুমি শুধু রাত্রির হবু শ্বশুরের বাড়ি দেখেই ফিরে এসো না। উনার লোন আছে কী না, থাকলে কত টাকা লোন সেটাও জানো এবং সবাইকে জানাও।" ৯০

## প্রভুযিশু আমার জিপিএস

(১০৮ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাণ্ডেজের কারণে যে চটিজুতা পায়ে হাঁটছিল পায়ে হাত বুলিয়ে দেখলো সামান্য একটু ব্যাথা আছে। আবার যখন হাঁটতে শুরু করলো আশ্চর্য হয়ে দেখলো সামনে আর মেয়েটি নেই। কোথায় উধাও হয়ে গেছে। চারিদিকে যতদূর চোখ যায় তন্নতন্ন করে খুঁজলো, কিন্তু দেখতে পেলনা। স্থানটির আশপাশে কোন গাড়ী পার্কিং নেই। যে গাড়ী করে চলে যাবে। বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল। আজও তার বদ্ধমূল ধারণা, মেয়েটি তার জীবনে এঞ্জেল হয়ে এসেছিল এবং নিঃসঙ্গ জীবনে প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও চিত্তাকর্ষক তা হচ্ছে-

একদিন অন্য শহরে একটি ক্লিনিকে জরুরী ঔষুধ নিয়ে যাচ্ছে। হাইওয়েতে সমস্ত গাড়ী তার পাশ দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। প্রশস্ত রাস্তা, মাঝে মাঝে সুউচ্চ পাহাড়ের মধ্যদিয়ে কখনো বা দু পাশে থরে থরে সাজানো গম ও আঙ্গুরের বাগান তারই মধদিয়ে সরীসৃপের মতো আঁকাবাঁকা পথ এগিয়ে গেছে প্রায়ই অতিরিক্ত গতি I over taking এর কারণে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটে গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। তাই প্রেমা বেশ সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ দূরে সুউচ্চ স্থানে একটি আশ্বাস বাণীর সাইনবোর্ড তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তাতে বড়বড় করে লেখা আছে- "Jesus is my co-pilot" সে চমকে উঠলো। কথাগুলো তার হৃদয় স্পর্শ করলো। সে কিছুটা দূরে নিরাপদ স্থানে ইমারজেন্সী লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি পার্ক করে, তার পাশে বসার আসাটি থেকে সমস্ত কগজপত্র সরিয়ে পরিষ্কার করলো। সেই শুরু তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন এলো। আরো বেশী ধর্ম ও কর্মে মনোনিবেশ করলো। প্রতিদিন আসনটিতে ধূপধূনা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়। আসনটি ফাঁকা থাকে এবং সে মানসিক স্বস্থি পায়। অনুভব করে প্রভুযিশু তার পাশে আছেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কখন যে কথা শেষ করে সে নিরব হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। আবেগে প্রেমার চোখ দুটো ছল ছল করছে, নিরবতা ভঙ্গ করে সে আবার বললো দাদা, যিশু যেমন আমার কো-পাইলট তেমনি আমার জীবনের জি,পি,এস (Global Positioning System) বটে।

প্রেমার গোলাকার মুখমণ্ডল গোল গোল বড় চোখ, তার সাথে মানান সই মাথাভর্তি ঝাকড়া কালো চুল, উজ্জল শ্যামবর্ণ মেদহীন মাঝারি গড়ন, মুখে স্নিগ্ধ হাসি এবং ধোপদূরস্থ পোষাকে নিমেষেই নজর কাড়ে। তার নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লগলাম কি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মনের একান্ত কথাগুলো সে বলে গেলো। জানিনা নানা পারিপার্শ্বিক আবস্থার কারণে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার বিশ্বাসে বলিয়ান থাকতে পারবে তো? অযথা তর্ক করে তার গভীর বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাইলাম না শুধু বললাম তোমার বিশ্বাদের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। প্রভুযিশু সব স্থানে সর্বদা বিরজিত ভক্তরা ডাকলেই তিনি সাড়া দেন। আড্ডা ও খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা বিদায় নিতে নিতে প্রায় সাঙে এগারটা বেজে গেল। আমি প্রেমাকে পরীক্ষা করার জন্য একটু এগিয়ে গাড়ীর সামনের দরজাটা খুলে ধরলাম। প্রেমা ইতিমধ্যে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসেছে।

সুমিকে বললাম, আস সামনে বসো।

ও যেন আঁতকে ওঠলো, না দাদা না, ঐ স্থানটি ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুর জন্য। যতদিন কানাডা ছিলাম মাঝে মাঝেই শনিবার সন্ধ্যায় স্বস্ত্রীক হাজির হোত। আমরাও যেতাম সুযোগ মতো। আমেরিকায় স্থায়ীভাবে চলে আসার পর প্রথম প্রথম যোগাযোগ থাকলেও পরে তা বিভিন্ন কারণে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। ওই যে কথায় বলেনা "চোখের আড়াল হলে, মনেরও আড়াল হয়।" কদাচিৎ কথা হয়েছে তবে কৌতুহল থাকলেও লজ্জায় কোনদিন জিজ্ঞেস করিনি, আজও তার পাশের সিটটা সে যিশুর নামে খালি রেখেছে কি না? প্রেমা একটি গান প্রায়ই গাইতো

"যিশু জীবন পথের আলো,
আমার সাথে সাথে চলো" ॥ ৯০



নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন
সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

৮১ পথ চলার গৌরবময় বছর

# প্রভুযিশু আমার জিপিএস

## ডেভিড স্বপন রোজারিও

**“থ্যাঙ্কস** গিভিং” এর পর থেকেই সাধারণত আমি বড়দিনের সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বাড়ি-ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজানোর সমস্ত সরঞ্জামের বাক্স নিয়ে “ক্রিসমাস-ট্রি” সাজাতে বসি। দীর্ঘক্ষণধরে মনের মতো করে সাজিয়ে তবেই সুস্থির হয়ে বসি। রং বেরং আলোর ঝলকানিতে বসার ঘরে সাজানো ক্রিসমাস-ট্রি আলাদা একটি সৌন্দর্যের মাত্রা এনে দেয়। শুধু আমি না, আশপাশের বাড়ি রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট, বড়বড় মলগুলো অপূর্ব সাজে সেজে ওঠে। ঘর সাজানোর পর বড়দিনের কয়েকদিন আগে বাইরের দিকটা সাজাই। ছুটন্ত হরিণ, সান্তাক্লজ ও ঝলমলে তারা সারারাত জ্বলে সকালে নিভিয়ে দেই। পড়ন্ত বিকেলে বারান্দায় বসে এক কাপ ফুটন্ত চায়ে মৃদু চুমুক দিতে দিতে দেখছিলাম, কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা। হঠাৎ পণ্যবাহী বড় একটি গাড়ি আমার বাসার সামনে এসে থামলো। এক ভদ্রলোক ছোট একটি বাক্স নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। এটা নতুন কিছু নয়, এসময়ে বড়দিনের উপহার, বাড়ি বাড়ি পৌছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পণ্যবাহী গাড়িগুলি ছুটাছুটি করে। বাক্সটি হাতে নিয়ে চেয়ারের ওপর রাখলাম এবং প্রাপ্তিস্বীকার কাগজে সই করে ধন্যবাদ দিলাম। লোকটা চলে যাচ্ছিলো একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বললো, আপনি কি বাংলাদেশী খ্রিস্টান?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

ও একটু মুচকি হেসে বললো আমিও। আমার বাড়ি ফরিদপুর। আপনার?

বললাম, গাজীপুর। আসুন বসুন চা-খেয়ে যান।

সবিনয়ে বললো, আজ নয়, অন্যদিন আসবো।

বললাম বড়দিনের নিমন্ত্রণ রইলো, অবশ্যই আসবেন। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলো। সাধারণত সরাসরি কেউ এভাবে প্রশ্ন করেনা। বোধ হয় আমার নাম ও চেহারা দেখে তার মনে হয়েছিল, আমি বাঙালি।

তারপর বেশ অনেকদিন পার হয়ে গেলো। বোধ হয় ছ'মাস পরের ঘটনা হবে। বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে। আমি ও আমার স্ত্রী মুক্তা, মাখানো মুড়ি ও চা খাচ্ছিলাম, বারান্দায় বসে। একটি কালো গাড়ি এসে থামলো। সেই ভদ্রলোকটি একগাল হাসি দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো, সাথে স্ত্রী। হাতে একটি বড়সর কেক। বিগলিত কণ্ঠে বললো, দাদা-বৌদি নমস্কার। দেরীতে হলেও বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা নিবেন। সময়মতো না আসার কারণ হচ্ছে বাড়ি গিয়েছিলাম বিয়ে করতে। এই আমার স্ত্রী নাম সুমি সরকার।

রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়াতে চুটিয়ে আড্ডা দিলাম। আমার স্ত্রীর সাথে সুমি সহজেই মিশে গেলো। তারা উভয়েই রান্না ঘরে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমি প্রেমনাথের সাথে বসার ঘরে বসে নানা খোশগল্পে মেতে উঠলাম। আমার মতো নিরব ও মনোযোগি শ্রোতা পেয়ে সে আরও দুর্বার হয়ে উঠলো। শুদ্ধ উচ্চারণ ও আসাধারণ ... কারণে মুগ্ধ হয়ে শুনছি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান। কথার মাঝে মাঝে পবিত্র বাইবেলের উদাহরণ তুলে ধরে বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রেমনাথ পারদর্শী অবলীলায় পবিত্র... কানাডা আসা ও কষ্টকর জীবনে ধীরে ধীরে পতিষ্ঠা পাওয়া। ভাললাগা- না লাগা, পছন্দ-অপছন্দের নানা কথা নির্বিকার চিত্তে বলে গেলো। তার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরলাম।

ভদ্রলোকের নাম প্রেমানন্দ বিশ্বাস। বাবা রমেন বিশ্বাস। স্থানীয় ব্যাপটিস্ট চার্চের পাদ্রী, সে সুবাদে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে কানাডার রাজধানী অটোয়াতে একটি ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ পায়। পনের দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। তার রুমমেট ছিল খুলনার একজন প্রতিনিধি, সেই পরামর্শ দিল দেশে ফিরে কি লাভ। এ সুযোগ জীবনে আর কোনদিন হয়ত আসবে না। চলো এ দেশে থেকে যাই। প্রেমা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অভাব-অনটন সংসারে লেগেই থাকে। বিএ পাশ করার পর স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করে। সুযোগ মতো তারা একদিন ক্যামন থেকে পালিয়ে যায়। শুরু হয় কষ্টের জীবন। প্রথমে মন্ট্রিয়াল ছিল, ভাষার সমস্যার কারণে ছ'মাস পর টরেন্টো শহরে চলে আসে। একটি বাঙালি গ্রোসারিতে কাজ ও খাওয়া-থাকার সুযোগ জোটে এবং বিনিময়ে সে যাই পায় তাতেই সে তৃপ্ত। তবে আজও ধর্মীয় ক্যাম্প থেকে পালানোর অনৈতিক কর্মটা তাকে তাড়া করে ফেরে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়।

ইতোমধ্যে উকিলের পরামর্শ অনুসারে দেশ থেকে কাগজপত্র জোগাড় করে নিয়ে আসে কেস ফাইল করে এবং ছ'মাস পরে সে স্থায়ী বসবাস ও চাকরীর সুযোগ পায়। সে সুবাদে একটি নামীদামি কোম্পানীর সাপ্লাই কাজে নিয়োজিত হয়। বাঁধাধরা কাজ সকাল-সন্ধ্যা রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ঠিক এসময়ে দু'টো ঘটনা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে দারুণভাবে প্রাভাব বিস্তার করে। প্রথম ঘটনাটি এরকম একদিন ভারী একটি বাক্স নামাতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যায়। গোড়ালিতে ব্যাথা পায়। ভালমত পা ফেলে হাঁটতে পারেনা। ঔষধ খাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ব্যাথা যাচ্ছেনা। অফিস থেকে বেশ কয়েকদিন ছুটি নিয়েছে। একদিন ভারাক্রান্ত মনে একটি পার্কে এসে বসে। বিশাল ঝিল, চারিদিকে উঁচু গাছের নীচ দিয়ে সরু পিচঢালা রাস্তা, নির্মল বায়ুসেবনকারীদের জন্য উত্তম স্থান। ঝিলে অনেকে রংবেরং এর নৌকা বিহার করছে। একটি বেঞ্চে বসে প্রেমা ব্যাথা ভুলে থাকার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে। হঠাৎ দেখলো অল্প বয়স্কা একটা মেয়ে বাপাটা হাঁটু পর্যন্ত আগাগোড়া প্লাস্টার, ক্রাচে ভরদিয়ে অতিকষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ওর সামনে দিয়ে যাবার সময় মেয়েটি স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলো। প্রেমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সামান্য ব্যথায় সে কুঁকড়ে আছে অথচ ছোট মেয়েটি একপা দিয়ে কতো সুন্দর ভাবে হেঁটে যাচ্ছে কোন খেদ নেই, কোন অভিযোগ নেই। প্রেমা মনে খুব জোড় পেল। সে ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পা পেতে হাঁটতে লাগলো। ভুলে গেলো তার পায়ের ব্যাথা কিছুটা হাঁটার পর এক স্থানে মিনিট কয়েকের জন্য বসলো। বলাবাহুল্য

(১০৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# আমাদের বীরুদার বিয়ে

**সুনীল পেরেরা**

বীরুদার সব সময়ই কেবল পিটপিটানি স্বভাব। বিয়ের পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে তারপরও স্বভাব বদলাতে পারেনি। স্ত্রী গত হয়েছে পাঁচ বছর আগে। বিয়ের কথা বললে কেবলই নানা খুঁত ধরে। মেয়ের বংশ ভালোনা, গায়ের রং কেমন ঘোলাটে, কপালটা উঁচু, আর একটু লম্বা হলে মানানসই হতো, এমনি যতসব দোষ। বেশি জোরাজুরি করলে চড়া গলায় ধমক দেন। আমরা তিন চাটার দল তার ঘাড়ের ওপর বসে খাচ্ছি। খাচ্ছি মানে লিটু ফাস্টফুডের দোকানে চাকরি করে। বাসার রান্নাবান্না সব সেই করে। কাজের বুয়া শুধু ধোওয়া মোছার কাজ করে যায়। বটু কথা বলতে গেলে তোতলায় তাই ওর কাজ বাজার সদাই, কেনা কাটা সব। আর আমি পটু, বীরুদার খাস চামচা অর্থাৎ পিয়ন। কি করব, যতবার ইন্টারভিউ দিয়েছি ততবারই ফেল করেছি ইংরেজীতে কথা বলতে পারিনি বলে। তাই বীরুদা তার কাছেই আমাকে রেখে দিয়েছে। কাজটা যাই থাক অন্তত তিনজনে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি। এই বাজারে এটাই কম কিসের। বাইরে যে যাই বলুক ঘরে আমরা বীরুদার একান্ত বান্ধব। সে সব সময় নিজেকে নির্বান্ধব মনে করে। আসলে অতৃপ্তি মানুষকে ঘুরিয়ে মারে। ইদানিং কেমন যেন গোলগাল নিরামিশ চেহারা হয়ে যাচ্ছে তার। উকিল মোক্তার ডাক্তারদের যা হয় সচরাচর, বীরুদারও তাই হয়েছে। মাথায় বিশাল টাক পড়তে শুরু করেছে। রূপের ঔজ্জ্বল্য ও ধারালো ভাবটি ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কথায় বলে, বয়স যৌবন আর সময় বড়ই নিষ্ঠুর ধরে রাখা যায় না। ঠিক নদীর স্রোতের মতন।

রীরুদা সব সময় থিয়েটারী কায়দায় হা হা করে হাসত। তার হাসি, তার কথা ঠিক চুম্বকের মত মনে গেথে যায়। তবে ধর্মেকর্মে তেমন টান ছিলনা। কিন্তু শেষ বয়সে সারা জীবনের নাস্তিকেরও ধর্মের দিকে মন ফেরে। বীরুদার ইদানিং কালের কথাবার্তা, ভাবসাব দেখে শুনে তাই মনে হয়। কথায় কথায় শাস্ত্রের নীতি বাক্য টেনে আনে, ন্যায্যতার কথা বলে, জিজ্ঞেস করলে এক রহস্যময় হাসি দিয়ে বলে, আইন-আদালত করতে গিয়ে সারা জীবন এতো মিথ্যা নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছি, এখন যদি সত্যের সন্ধ্যান না করি তাহলে পরকালে কী জবাব দেবো? তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশে আজও ঘুচলনা ধর্মীয় বিভেদ। বীরুদার কথায় আমরাও ব্যথিত

হই, মুখ ব্যাজার করে তাকিয়ে থাকি। তখনই দাদা ক্ষেপে যায়, কিরে এমন গরু চোখের মত ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস কেন? প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি মুখে সহৃদয় হাসি ফুটিয়ে বললাম, দাদা আপনার মতন এমন একজন নিপাট ভদ্রলোক..... অমনি গালে ঠাশা এক থাপ্পর। আমার চোখে চোখ পাকিয়ে বলে, ফের যদি কোনদিন চাম্‌চাগিরি করিস তবে জিব ছিড়ে ফেলব।

বীরুদার অনেক বছরের পুরোনো ক্লায়েন্ট মধু পিউরি। খ্যানখ্যানে গলায় কথা বলে। টাকা চাইলেই খিক্‌খিক্ করে দাঁত বের করে হাসে। ওই পর্যন্তই, পকেটে আর হাত ঢোকে না, দু'পাশের ঠোটের ডগা পর্যন্ত বাহারী গোঁফ। এত বয়সেও মনে হয় বেশ খাটিয়ে লোক। কালোপনা মুখে পান খাওয়া দাঁত একশ বিঘার উপর জমিজমা। এখনো শহরে আসে সেই মান্দাতার আমলের তিন পকেটঅলা হাফ শার্ট আর লুঙ্গি পড়ে। পায়ে ভ্যানে বিক্রিত একদরের ৭০ টাকা দামের স্পঞ্জ। একশতে একশোই মিথ্যে কথা বলে। কোচরভর্তি টাকা নিয়ে কোটে আসে ঠিকই, কিন্তু বান্দার কোচর থেকে টাকা খসানো দুরূহ ব্যাপার। স্বয়ং বীরুদাও পারেনি। লোকটাকে বীরুদা বেশ কয়েকবার বাতিল করে দিয়েছে, তারপরও অন্যান্য উকিলদের পেছনে ঘুরেফিরে ধাক্কা খেয়ে আবার বীরুদার চেম্বারেই ঘুরাঘুরি করে। ঘাড়ে পাঁচটি মামলা। ওয়ারিশদের সাথেই দু'টি মামলা। একচুল জমিও ছাড়তে নারাজ। রাস্তার ফুটপাতে বসে হাতেবেলা পাতলা রুটি খায় চায়ে ভিজিয়ে। বিয়ের পরে পাঁচ ছেলেকে শুধু ঘর তোলার জন্য পাঁচ টুকরো জমি দিয়ে ভিন্ন করে দিয়েছে। একটা মাত্র মেয়ে, অল্প বয়সে বিধবা হয়ে তিনটা মেয়ে সন্তান নিয়ে বাপের সংসারে চলে এসেছে। মেয়েটাকে রাতদিন খাটায় একেবারে দাসীবান্দীর মত। এই বিরক্তিকর লোকটা হঠাৎ ক'দিন ধরে দেখছি বীরুদার সাথে কি সব নিয়ে আলাপ করে। দুইদিন দাদা তাকে হোটেলে ভূনাখিচুরি খাইয়েছে। আজকে আবার বিরানীর হোটেলে ঢুকেছে। এসবই হচ্ছে আমাকে আড়াল করে। মধু পিউরি এখন আর আমাকে জিজ্ঞেস করে না, 'স্যার চেম্বারে আছে?' আমাকে কেমন যেন উপেক্ষা করে গম গম করে ভেতরে ঢুকে যায় অন্য ক্লায়েন্টের সামনেই। দেখলাম, দাদাও কোন বিরক্তি প্রকাশ করে না, বরং আমাকে দিয়ে চা আনিয়ে

খাওয়ায়। আরও তাজ্জব হয়েছি আজকে মিষ্টি আর সিঙ্গারা আনিয়েছে। দুপুরে তিন প্যাকেট বিরানীও আনতে বলেছে দাদা। এসব দেখে আমি কেবলই ঘামছি, কী হচ্ছে এসব ভেলকি বাজী? মধু পিউরিকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাস করলে কেবল রহস্যময় হাসি দিয়ে বলে, সময় হইলে বুঝবা। বুঝবা মানে? এতদিন আমাকে আপনি আপনি করে তেল দিয়েছে আর আজকে ...।

বিকেলেই মধু পিউরি হাসি মুখে কোর্ট থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। বীরুদা আর আমি বেরুতে বেরুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। পথে নামতেই দেখি সারা আকাশে রক্ত লেপন করে সূর্যটা ডুবে গেল। একটু পরেই ঝমঝমিয়ে ছুট বৃষ্টি নামল। শহরের বাইরে আসতেই দেখি পথের ধারের গাছগুলো বৃষ্টির পানিতে ভিজে যেন খলখলিয়ে বেড়ে ওঠেছে। মনোরম সন্ধ্যায় বসন্তের বাতাস হিল্লোলিত হচ্ছে গাছের পাতায় পাতায়, অথচ আজকে সকালেও ছিল ঝকঝকে সোনালী রোদ। গাড়ির জানালায় ধোঁয়া রঙের কাচ। ব্যাক লাইটের লাল আলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন আলোর মিছিল চলছে। রাস্তাটা যেন তার সাথেই ছুটে চলেছে সারাক্ষণ। বাতাসে গাছগাছালির কেমন যেন মৌন গন্ধ বেরুচ্ছে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি সেটা জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম না। গাড়িতে গান বাজছে, তার সাথে মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে সুর মেলাচ্ছে বীরুদা। বীরুদার মন-মেজাজ খুশিতে ভরা থাকলে আমাদের কাজ করতে আনন্দ লাগে। হঠাৎ ক্যাচ করে রাস্তার ধারে মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে বীরুদা নেমে গেল। আমাকে নামতে পর্যন্ত বলেনি। দুইহাতে চার কেজি মিষ্টি নিয়ে এসে বীরুদা বলল, মিষ্টিটা এখান থেকেই কিনে নিলাম। গ্রামে তো ভালো মিষ্টি পাবো না। আমি হ্যাঁ-হু কি বললাম নিজেই শুনতে পেলাম না। আমি তখন ঘোরের মধ্যে আছি। ভাবছি কোন ক্লায়েন্টের বাড়িতে উকিলে মিষ্টি নিয়ে যায় এটা কখনো শুনি নি। বরং উল্টোটাই দেখেছি। গাড়িটা দূরন্ত গতিতে চলছে কিন্তু তার চেয়েও দ্রুততর গতিতে ভাবছি আমি।

উপশহরের শেষ প্রান্তে একটা টিনসেড দালানের পাশে এসে গাড়িটা থামল। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমেছে। বৃষ্টিভেজা আকাশে মেঘ ঠেলে চাঁদের মিহি জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে। বাড়িটার চারিদিকেই বড় বড় গাছ। রাতের বেলায় ঘন বনভূমি মনে হচ্ছে। ঘরের বাইরে খানিকটা উঠানের মত। একপাশে কয়েকটা ফলের গাছ। তারমধ্যে কামিনী গাছটায় ফুল ফুটতে শুরু করেছে। তারই মিষ্টি ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়াচ্ছে। মা বলতেন, বাড়িতে কামিনী ফুলের গাছ রাখলে ফুলের গন্ধে রাতের বেলায় সাপ আসে। বীরুদাই দরজায় নক করলেন। আমার হাতে মিষ্টির প্যাকেট। দরজা খুলতেই একরাশ আলো আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়ল। দরজা খুলেছে একটি যুবতী মেয়ে। খুলে দিয়েই 'আসুন' বলে ভেতরে চলে গেল। বসতে বলেনি তবু আমরা বসলাম। বসলাম মানে বীরুদাই আমাকে বসতে বললেন। যেন বাড়িটা তারই, আমি মেহমান এসেছি। দেখলাম বীরুদার মুখে প্রসন্ন হাসি। ঘরের একপাশে খালি গায়ে একটা ভোম্বল মার্কা ছেলে ঘুমুচ্ছে। মেয়েটি চলে যাবার আগে ওকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেও সে তোয়াক্কা না করে পূর্বের ন্যায় 'দ' হয়ে ঘুমুচ্ছে। আমাদের মৃদু আলাপের শব্দে মুখভর্তি বিরক্তি নিয়ে উঠে বসে তারপর মাদুরটা বগলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

মেয়েটি ঠিক পায়রার মতন বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আমাদের শুধু একবার আসুন বলেই সেই যে ভেতরে চলে গেলো আর এলোনা। না ওর বাবা, না ওর মা। ধাবমান হরিণের মত ওর চলে যাওয়া, হয়তো সদ্য স্নান করেছে। চুলের ডগায় টুপ টুপ করে শিশিরবিন্দুর ন্যায় জল পড়ছে। অদ্ভূত সজীব চোখ। মোমবাতির আলোর মতন তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি বড় স্নিগ্ধ কিন্তু বিষন্ন। এমন সুন্দরী আর দুঃখী নারী আমি জীবনে দেখিনি। সর্ব অঙ্গে যেন কারুকাজ। নৈঃশব্দের মহড়া চলছে ঘরে। আমরা বসে আছি স্থির অচঞ্চল দীপশিখার মত। মেয়েটিকে দেখেই আমার হৃদয়েও কেমন যেন ভালোবাসার ভাব জমে ওঠেছে। অনেক সময় না বলা কথা, বলা কথার চেয়েও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। বীরুদা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলি, পছন্দ হয়েছে? আমি মনের আবেগে তাৎক্ষনিক ভাবে উত্তর দিলাম, দারুন চেহারা প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়েছে। আমার অন্তরে তখন ঝড় বইছে বিয়ের। তবে কি বীরুদা আমার জন্য মেয়ে দেখতে এসেছে? আমার উত্তরে বীরুদা পুলকিত হলো। ঠিক বলেছিস, নারীদের বর্ণনা হয় রূপ দিয়ে। ঠিক চালতা ফলের ন্যায় গৌরবর্ণ গায়ের রং মেয়েটির। এ সময় ঘরে ঢুকল এক প্রবীণ ব্যক্তি। লোকটা এত বুড়ো যে তার পক্ষে আর বুড়ো হওয়া সম্ভব নয়। তার সাদা চুল দাঁড়ি, টকটকে গৌরবর্ণ রঙের জৌলুস আছে দেহে। বয়স বেড়েছে বটে তবে শরীরের বাঁধুনি দেখে বুঝা যায় এককালে লড়িয়ে পুরুষ ছিল। পরিচয়ে জানা গেল তিনি পাশের বাড়ির প্রতিবেশী তবে সম্পর্কের আত্মীয় নন। তার পেছনে অনেকটা আঁড়ালে এক নারী। হয়তো মেয়ের মা। স্কুল শিক্ষিকার মতন নিরীহ চেহারা। দুঃখিনী মায়েরা বোধ হয় এমনি হয়, মনের মধ্যে শতদুঃখ পুষে রাখে। পাশের ঘরে হাতের চুড়ির শব্দ বাজছে জলতরঙ্গের সুরে। ট্রে হাতে মেয়েটি এলো চা আর মিষ্টি নিয়ে। মেয়েটিকে একটা টুলের উপর বসতে বলল দাদু। চা খেতে খেতে বীরুদা মেয়েটিকে দু'চারটি প্রশ্ন করল। লজ্জায় আমি কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বীরুদা বলল, মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে। যত শিগ্র সম্ভব আমরা বিয়ের ব্যবস্থা করব।

সেরাতে ফিরে এসে আমার নির্ঘুম কাটল। বীরুদা অনেক রাত পর্যন্ত ফোনে জরুরী আলাপ করেছে, তাই তার সাথে কোন কথাই হয়নি। পরের দিন মধু পিউরির সাথে বসে বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। মেয়েটা অর্থাৎ শিউলির মূল অভিভাবক মধু পিউরি। এই কয়দিনের ফুশফাস আলাপন শিউলিকে নিয়েই। বাপমরা মেয়ে, লেখাপড়া করেছে, বিয়েও হয়েছিল। মাত্র এক সপ্তাহ স্বামীর সংসারে ছিল। হঠাৎ করে স্বামী মারা যাওয়ায় সে আর সেখানে থাকেনি। সাত ভাইয়ের সংসারে যুবতী বিধবা বৌয়ের কী দুর্দশা হবে সে চিন্তা করেই চলে এসেছিল।

বিকেল তিনটে বাজেতেই বীরুদা আমাকে বিদেয় করে দিয়ে মধু পিউরিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল গতকালের পথে। ভাবলাম ওকালতি বিদ্যায় এই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠ কে? বীরুদা না মধু পিউরি? আমরা তিন চাটার দলে এতো চেষ্টা করেও যা পারিনি, মধু পিউরি কী করে তা পারল? আসলে জীবনে কোন না কোন সময়ে নিজের মনের দিকে তাকাতেই হয়। বীরুদা হয়তো তাই করেছে। এতদিন কারও সাথে মনের মিল হয়নি তাই সময় পাড় করেছে। এবার খুঁজে পেয়েছে মনের মত রাজকন্যা।

মহাধূমধামে বীরুদার বিয়ে হবে, কত আনন্দ, খাওয়া দাওয়া হবে ভেবেছিলাম, তা কিছুই হয়নি। বীরুদা মেয়েকে নিয়ে গির্জায় গেল সামান্য সাজগোজ করে। বিয়ের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলো। মেয়েপক্ষের সাকূল্যে পাঁচজন অতিথি এলো। সেই বুড়ো আসেনি। মধু পিউরি একাই এসেছে। হোটেল থেকে খাবার আনা হয়েছে। তারপর বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত। পরদিন সকালে বীরদা নতুন বৌকে নিয়ে হানিমুনে চলে গেল কক্সবাজার॥

# ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম

**রুমা জেকলিনা কস্তা**

ধোঁয়াসা অন্ধকার হয়ে আসছে চারিদিকে, মানুষজন সবাই ছুঁটে চলছে বাড়ি ফেরার পথে, পাখিগুলোও নীড়ে ফিরছে দল বেঁধে, কেউ কেউ আবার সন্ধ্যার আড্ডা জমানোর জন্য চা-স্টলের দিকে যাচ্ছে। চারিদিকটা বেশ ব্যস্ততম, অনেক মানুষের আনাগোনা। এত ব্যস্ততম শহরেও কিছু কিছু মানুষের জন্য সময় যেনো থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকে, সব কিছু থমথমে মনে হয়, ঠিক যেমনটা হয়েছে তুষারের জীবনে। শহরের রাস্তার পাশে আনমনা হয়ে আঁধভাঙ্গা একটা বেঞ্চে বসে আছে তুষার, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার উপর কোনো এক হতাশার তিমির বাসা বেঁধেছে। আশেপাশে এত মানুষ আছে কিন্তু তুষারের মনে হচ্ছে সে যেন সবচেয়ে একা এই পৃথিবীতে, সব চেয়ে বেশি অসহায়। তুষার ভাবছে তার জীবনটা এমন কেনো হলো? তার সাথেই কেনো এমন হয়? আজ দুপুর থেকে তার খাওয়া দাওয়া হয়নি, বাড়িতে কোন রান্না হয়নি কারণ চাল ডাল কিছুই নেই, তার উপর বাবা মায়ের ঝগড়া অশান্তি, তুষার আর নিতে পারছে না। এখনকার দিনেও মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়? তার খুব রাগ হয় মনে মনে, এমন বাবা মায়ের ঘরে কেন তার জন্ম হলো যারা নাকি ঠিকমতো তিনবেলা খাবারটা পর্যন্ত দিতে পারেনা। কোনরকমে পড়াশুনাটা চালিয়ে যাচ্ছে, টাকার অভাবে অনার্স পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হলনা, তাই বাসার পাশে নরমাল একটা কলেজ থেকে ডিগ্রি করতে হচ্ছে। ছোট বোনটাও স্কুলে পরে, সেও ঠিকমত কোনো কিছুই পায় না। তুষারের অভাব অনটন আর অসহায় অবস্থার জন্য তার তেমন কোনো বন্ধু-বান্ধব ও নেই। একা একা বসে এসব ভাবতে ভাবতে চারিদিকে অন্ধকার নেমে এলো। এমন সময় হঠাৎ রাস্তার ওপাশ থেকে তার মায়ের গলা শুনতে পেল। তুষারকে ডাকছে তার মা। তুষার তার মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখলো ভাত রান্না হয়েছে সারাদিন পরে, আলুভর্তা আর ডাল দিয়ে। তুষারকে তার মা ভাত দিল। সারাদিন পরে ডাল আর আলু ভর্তা দিয়ে ভাত যেনো অমৃতের মতো মনে হলো তার। খুব তৃপ্তি করে ভাত খেলো তুষার।

পরের দিনের ভোরটাও কোনো ব্যতিক্রম ছিলোনা তুষারের কাছে, সেই ঝগড়া-ঝাঁটি, চিৎকার-চেঁচামেচি দিয়েই ঘুমটা ভাঙলো তার। তুষারের খুব মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেলো, ফ্রেশ হয়ে তার ছোট বোন তমাকে বললো, একটু চা হবে রে? তমা মুখ গুমরা করে বললো, না বাসায় চিনি নেই, তুষার কিছু না বলে বাসা থেকে বেড়িয়ে গেলো। সারাদিন এদিক সেদিক করে কেমন করে যেন পার হয়ে গেল, বিকেলে তুষার সেই একই জায়গায় সেই ভাঙ্গা বেঞ্চটাতে বসে আছে, তাকে বিভিন্ন ভাবনা ঘিড়ে ধরেছে, তার মনে হচ্ছে সে এক বিশাল সমুদ্রে পড়ে গেছে সেখান থেকে আর কোনদিন হয়তো উঠতে পারবেনা। সে বারবার তার পরিবার, তার জন্ম সবকিছুকে অভিশাপ বলে মনে করছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায়, তুষার ভাবল এবার বাড়ির দিকে যাওয়া যাক, সে উঠে দাঁড়ানোর আগেই তার চোখে পরলো একটা কাগজের খাম, সে ঠিক বুঝতে পারছে না খামটা দেখবে কিনা? কি মনে করে সে খামটা নিয়ে খুললো, দেখলো ভিতরে একটা ছোট্ট কাগজে লেখা “don’t waste your time”. তুষার ভাবলো এটা আবার কার? তেমন তো দরকারি কিছু না, সে খামটা হাতে করে নিয়ে পাশের একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলো।

রাতে ভালোমতো ঘুম হলোনা তুষারের, নানা চিন্তা তাকে ঘিরে ধরছে, হঠাৎ তার ওই কাগজে লেখাটির কথা মনে হলো, “don’t waste your time”, সে মনে মনে ভাবলো, লেখাটি কার জন্যে ছিলো? আমি নিজেও কি তাই করছি? আমি কি আমার জীবনের সময়গুলো নষ্ট করছি? কিন্তু কি’বা করার আছে আমার? আমি তো মধ্যপথে আটকে আছি, চাইলেও কি কিছু করা সম্ভব? নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় তন্দ্রা তাকে ঘিরে ধরলো।

প্রতিদিনের মতো সকাল বেলা বাড়িতে কোনো কোলাহল হলো না তাই তুষার লম্বা সময় ধরে ঘুমালো, ঘুম থেকে উঠে দেখে সকাল দশটা বেজে গেছে, কেউ তাকে ডেকেও তুললো না। ঘুম থেকে উঠে সে দেখলো বাসায় কেউ নেই, ঘটনা কি সে কিছু বুঝতে পারছে না, অনেকটা ভয় পেয়ে গেলো সে, তারপর তার বোনকে ডাকতে শুরু করলো। কিন্তু কারো কোনো সাড়া না পেয়ে বাহিরে বেড়িয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে দেখলো তার বোন আর তার মা একসাথে করে বাসায় আসছে, তুষার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললো কি ব্যাপার তোমরা গিয়েছিলে কেথায়? কি হয়েছে? তুষারের মা কোনো জবাব দিলো না, তুষার তার বোনকে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে বলবি তো? তমা বললো তুমি জানোনা ভাইয়া কাল রাতে বাবা বাসায় ফিরেনি, সকালে ঘুম থেকে উঠে আশেপাশে খোঁজ করলাম কোথাও নেই, মোবাইলটা ও বন্ধ। তুষার কোনোরকম বাসায় গিয়ে শার্টটা হাতে নিয়েই তার মাকে বললো, মা আমি দেখছি বাবা কোথায়, তুমি টেনশান করো না। তুষারের মা বললো, দাঁড়া এই টাকাগুলো নিয়ে যা, তুষার তার মায়ের কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো। সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করার পরেও যখন কোনো খবর পাওয়া গেলো না দেখে তুষার লোকাল থানায় গেল তার বাবার জন্য খোঁজ করতে। অবশেষে কোনো উপায়ই হলো না দেখে সে বাসায় ফিরে এলো।

দিন, সপ্তাহ করে অনেক দিন পেরিয়ে গেলো, তুষারের বাবা আর বাড়ি ফিরলেননা। তুষারের মা চিন্তায় চিন্তায় পাগল প্রায়, ঘরে খাবার নেই, পাশে কেউ নেই। তুষারের দুচোখে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সে কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। তার ছোট বোনটার মুখের দিকে সে তাকাতে পারছেনা। খেয়ে না খেয়ে দিন পার করতে হচ্ছে, পড়াশুনা তো প্রায় বন্ধ দুজনেরই। পয়সার অভাবে বাবার খোঁজও করতে পারছেনা।

অনেকদিন পরে তুষার হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই পুরাতন জায়গায় আসলো, যেখানে একটা ভাঙ্গা

বেঞ্চটা ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ ওখানে যায়না মনে হয় তুষার ছাড়া। তুষার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেঞ্চটাতে বসতে যাবে তখনই তার চোখে পড়লো আবারও একটা সাদা

খাম, সে কিছুটা অবাক হয়ে খামটা খুলতেই তার চোখে পড়লো সেই একই লেখা "don't waste zour time". সে আশেপাশে কয়েকবার তাকালো কাউকেই দেখতে পেলোনা, তার কেমন যেন রহস্য মনে হলো, সে এখন ভাবতে লাগলো এটা কি কেউ তাকে উদ্দেশ্য করে করছে? সে তখন কাগজটা উল্টে দেখলো কাগজের অপর দিকে একটা মোবাইল নাম্বার লেখা আছে। সে ভাবলো দেখি তো একটা কল করে কার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। সে তার পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে কল করতেই কেউ একজন ভারি কণ্ঠে বললো, কে বলছেন? তুষার একটু হক্‌চকিয়ে গিয়ে বললো, আমি তুষার, আপনি আমাকে চিনবেন না, আসলে আমি একটা খামের মধ্যে.... সে কথা শেষ না করতেই ওপাশ থেকে লোকটা বললো আপনার কি কাজের প্রয়োজন? তুষার একটু অবাক হয়ে গেলো কিছুটা ভয়ও পেলো ঠিক বুঝতে পারছেনা সে কি বলবে! লোকটাই বা কে? কি কাজের কথাই বা বলছে? এক মুহূর্তে ভাবলো, লোকটা আবার বললো কি হলো কিছু বলছেননা কেন? আপনার যদি কাজের প্রয়োজন হয় তাহলে একটা ঠিকানা দিচ্ছি এসে যোগাযোগ করুন। তুষার ভাবলো আসলেই তো সে যদি কেনো কাজ পায় তাহলে তো তার জন্য ভালোই হয়, তার বাবা এই মুহূর্তে নিখোঁজ আর তাকেই তো সংসারের হাল ধরতে হবে। তাই সে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে বললো ঠিকানাটা বলেন প্লিজ। লোকটা তাকে বলে দিলো কোথায় যেতে হবে।

তুষারের মনে নানান প্রশ্ন ঘুড়পাক করতে লাগলো, কি ধরনের কাজ হতে পারে, আবার কোনো খারাপ চক্রের ফাঁদে পড়েতে যাচ্ছে না তো? তাকেই কি উদ্দেশ্য করে খামটা রাখা হয়েছিলো? আরো অনেক কিছু। কিন্তু একটা কথা সত্যি যে তাকে এই মুহূর্তে কোন কাজ করতে হবে টাকা ইনকাম করতে হবে এটা তার মাথাতেই ছিলোনা, কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে সে বুঝতে পারলো যে, তার কোনো কাজ করা উচিত। সে মনে মনে ভাবলো, গিয়েই দেখি যদি বুঝতে পারি যে খারাপ কিছু তাহলে কাজটা করবোনা। এই ভেবে সে মনে মনে প্রস্তুতি নিলো যে, সে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাবে ওই ঠিকানায়। কিন্তু তার মা বা বোন কাউকেই কথাটা বললো না।

পরের দিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়ে ফোন করে ঠিকানাটা নিয়েই বেড়িয়ে পরলো, সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলো একটা বড় রেস্টুরেন্ট, অনেক ব্যস্ত, অনেক লোক কাজ করছে, সেখানে যেতেই তাকে একটা লোক বললো, আপনি তুষার? সে একটু অবাক হয়ে গেলো, তাকে তো রিতিমতো চেনে, সে বললো, জি আমি তুষার। লোকটি বললো আসেন আমার সাথে। লোকটি তাকে নিয়ে দোতালার একটা অফিস রুমে নিয়ে গেলো। ওখানে দেখতে পেলো একজন ভদ্রলোক বসে আছেন, তার গায়ের রং ফর্সা, নাকটা লম্বা, খুব সুন্দর, দেখতে প্রায় বিদেশী চেহারা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি হয়তো এই রেস্টুরেন্ট এর মালিক হবেন। তুষারের ভিতরে কিছুটা ভয়, কিছুটা কৌতুহল কাজ করছিলো। জীবনের প্রথম কোথাও এলো চাকরির উদ্দেশে। তো লোকটা খুব সুন্দর করে তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি তুষার কেমন আছো? তোমার পরিবারের সবাই ভালো আছে? তোমার রাস্তায় আসতে কোনো কষ্ট হয়নিতো? তুষার লোকটাকে যতই দেখছিলো ততই অবাক হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো লোকটা তাকে অনেক আগে থেকেই চিনেন। তুষারের বুঝতে দেরি হলো না উনিই রেস্টুরেন্ট এর মালিক এবং আরো জানতে পারলো উনার দেশে এবং দেশের বাইরে কয়েকটা দেশে আরো অনেকগুলো নামিদামী রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এতো টাকার মালিক যিনি, তিনি তুষারের মতো এরকম একটা ছেলের সাথে এত সুন্দর ভাবে কথা বলবেন তুষার ভাবতেও পারেনি। যা হোক তুষারকে জিজ্ঞেস করলো তাদের ওখানে আপাতত ডেলিভারি ম্যান লাগবে সে করতে পারবে কিনা? এবং সময় শুরু হবে বিকাল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। বেতন খারাপ না, গাড়ি বা বাইক মালিকের, তো তুষারের বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা ছিলো এবং ডিউটির সময়টাও খুব সুন্দর ছিলো যা তার কলেজে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে কোনো সমস্যা হবে না। তাই তুষার এক কথায় রাজি হয়ে গেলো। তুমি পরের দিন থেকেই জয়েন করতে পারো এবং বেতন প্রতি সপ্তাহে পাবে।

তুষার বেশ খুশি খুশি হয়ে বাড়িতে ফিরলো। তার মা আর বোনকে তার চাকরির কথা বললো। তার মা মনে হলো অনেকটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো। বললো বাবা তোমাকেই তো এখন সংসারের হাল ধরতে হবে আশীর্বাদ করি যেন সব কিছু ভালো হয়। জানি না তোমার বাবা কোথায় আছে কি করছে? মানুষটা কখনোই আমাদের শান্তি দিলো না, আর এখন.. তুষার বললো- থাকনা মা এখন এসব কথা, বাবা সব সময় হয়তো ইচ্ছা করে এমন করতোনা, অভাব অনটনে বাবার মাথা ঠিক থাকতো না, আর দেখবে এক সময় হয়তো বাবাকে আমরা ঠিকই খুঁজে পাবো। তারা তিনজন একসাথে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমাতে গেলো। সারারাত তুষারের চোখে ঘুম এলোনা, তার ভেতরে কেমন যেন অস্থিরতা কাজ করতে লাগলো, নানান চিন্তাগুলো যেন তাকে তাড়া করতে লাগলো। তবে সে মনে মনে বললো আমাকে এখন শক্ত হতে হবে, আমার দায়িত্ব যে অনেক এখন, মনোযোগ দিয়ে যদি কাজটা করতে পারি তাহলে আমি নিজেই সংসার চালাতে পারবো, বাবা যখন ফিরে আসবে এসে যেন দেখতে পারে আমাদের সংসারে এখন আর অভাব নেই তখন আর বাবা মায়ের মধ্যে ঝগড়া হবেনা। আচ্ছা বাবা হঠাৎ কোথায় চলে গেলো? কেনোই বা গেলো? এরকম ঝগড়া তো তাদের বাড়িতে নতুন কিছু নয়, তাহলে এখন কেন? নাকি আবার অন্য কিছু! বাবার সত্যি খারাপ কিছু হয়নি তো? না তুষার আর ভাবতে পারছেনা, তার দু'চোখ বেঁয়ে জল ঝরতে লাগলো।

পরের দিন তুষারের কর্মজীবনের প্রথম দিন যদিও তার কাজ শুরু হবে চারটা থেকে, কিন্তু সে প্রায় একঘন্টা আগে গিয়ে পৌঁছালো, ওখানকার ম্যানেজার তুষারকে তার কাজ বুঝিয়ে দিলো, চারটা থেকে তুষার যথারীতি কাজ শুরু করে দিলো। ভালোই গেলো দিনটা, সুন্দরমতো তার কাজ শেষ করে বাসায় আসলো। এভাবে বেশ কয়েকদিন চলে গেলো, প্রতি সপ্তায় বেতন পাচ্ছে, তার মায়ের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে, সংসারের অভাব অনটন সব ঘুঁচে গেলো। দিনে দিনে সে মালিকের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠলো।

সে ডেলিভারি ছেড়ে কাস্টমার সার্ভিস করলো, তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই ম্যানেজার হয়ে গেলো। সবাই তুষারকে অনেক ভালোবাসে। তুষার তার ডিগ্রি পাশ করে মাস্টার্স এ ভর্তি হলো, তার বোনের পড়াশুনাও সুন্দরমতো চলছে। তাদের পরিবারে যেনো অনেক শান্তি ফিরে এলো কিন্তু তার বাবার অভাবটা আর কোনো কিছুতেই পূরণ হয়না।

তুষার এত ব্যস্ততার মধ্যেও তার বাবার খোঁজ ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে।

তুষারের যখন মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হলো তখন তার মালিক একদিন তুষারকে বললো তুষার তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিলো, একদিন চলো আমার বাসায় ডিনার করতে করতে কথাও হয়ে যাবে। তুষার আর উনার কথা ফেলতে পারলোনা। প্রথমবারের মতো বস এর বাসায় যাচ্ছে তুষার, ভিতরে একটু ভয় একটু সংকোচ কাজ করছিল তার। যদিও মালিক তাকে অনেক ভালোবাসে।

মালিকের বাড়ির গেট খুলে দিলো দারোয়ান, বিশাল বড় বাড়ি, দেখেই ভয় লাগছিলো, বাড়ির দরজার সামনে যেতেই একটি মেয়ে আসলো তাকে রিসিভ করতে, বেশ লম্বা, সুন্দর চেহারা, ধবধবে সাদা, বাঙালি মেয়ে এত সুন্দর হয়!

মেয়েটা বললো আপনি তুষার তাই না? বাবার মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি, এটাই যে মালিকের মেয়ে তুষারের বুঝতে আর বাকি থাকলো না। তুষার শুধু মুচকি হেসে বললো তাই? মেয়েটা বললো আমি তিন্নি, আপনার নামের সাথে আমার নামের মিল আছে। তুষার আবার হেসে বললো নাইস টু মিট ইউ।

তুষারকে খুব যত্ন করে তিন্নি ভিতরে নিয়ে বসালো। তারপর তার বস এবং তার স্ত্রী আসলো, তাকে খুবই আপ্যায়ন করলো, তুষার খুবই অভিভূত হলো, এতটা সে আশা করেনি। ডিনারে থাকলো অনেক আয়োজন, একসাথে সবাই খাওয়াদাওয়া আর গল্প করলো। তারপর তার বস বললো তুষার আসলে যে কথাটা বলার জন্য তোমাকে ডেকেছি তা হলো, আমি চাই আমার এই রেস্টুরেন্ট এর পুরো দায়িত্বটা তোমাকে দিতে, তুমি তো এখন সব কিছুই মোটামুটি জানো, আমার তো নিজের ছেলে নেই একটাই মেয়ে, বিদেশের ব্যবসাগুলো সামলাতে অনেক হিমশিম খেতে হয়, তাই আমি চাই তুমি যদি এখানকার ব্যবসাটা দেখাশেনার দায়িত্ব নাও তাহলে আমার জন্য অনেক ভালো হয়। তুষার ঠিক কি বলবে ভেবে পচ্ছিলো না। সে বললো স্যার আমি যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমার খুব ভালো লাগবে, কিন্তু আমি কি সামলাতে পারবো? তার মালিক বললো কেনো পারবেনা অবশ্যই পারবে, আর তাছাড়া আমি তো আছি।

তুষার বাড়ি ফিরেই তার মাকে বললো ঘটনাটা, সে এত বড় ব্যবসা পুরো দেখাশোনার দায়িত্ব পেল, তার বেতন এখন আরো অনেক বেড়ে যাবে। তারা সবাই বেশ খুশি হলো। তুষার বললো মা এখন তো আমরা এই ছোট বাসাটা ছেড়ে বড় একটা বাসায় উঠতে পারি। কিন্তু তার মা রাজি হলো না বললো, না তুষার আমি এই বাসায়ই থাকবো, যদি তোর বাবা এসে দেখে আমরা এই বাসায় নেই, তাহলে কিভাবে আমাদের খুঁজে পাবে? তুষার চুপ করে রইলো, তুষার বুঝলো আসলে তার মা তার বাবাকে কতটা ভালোবাসে, হয়তো অভাব অনটনের জন্য তাদের মধ্যে এত অশান্তি ছিলো, কিন্ত সত্যিকারের ভালোবাসা এতটা ছিলো কখনো বুঝতে পারেনি। তুষার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললো বাবা তুমি ফিরে এসে দেখো আমাদের অবস্থা আর আগের মতো নেই, আমরা সবাই তোমাকে কতটা ভালোবাসি।

তুষারের রাতে ঘুম হলো না অনেক কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক করতে লাগলো, তারমধ্যে সুন্দর দুটি চোখের দেখা মিললো বারবার, সেটা কার চোখ? সেটা তো আর কেউনা, আজকের সদ্য পরিচিত মানুষটির চোখ, সেই সুন্দর মিষ্টি মেয়েটি তিন্নি, তুষারের মনে খুব করে জায়গা করে নিল, একদিনের পরিচয়েই। তুষার ভাবলো, না না ছি! আমি এসব কি ভাবছি, আমি কোথায় আর সে কোথায়, এটা ভাবাও আমার ঠিক না। তার এ ভালোলাগার এখানেই মৃত্যু ঘটাতে হবে, কাউকে এ ব্যাপারে কখনো জানতে দেওয়া যাবে না।

যথারীতি তুষার পুরো ব্যবসার দায়িত্ব পেলো, সবাই তাকে খুব ভালো সাপোর্ট করছে, তার রেজাল্ট হয়েছে সে ভালোমতো পাশ করেছে। অনেক ব্যস্ততায় দিন পার হচ্ছিলো। তুষার তার ধৈর্য আর যোগ্যতা দিয়ে ব্যবসার আরো অনেক উন্নতি করতে লাগলো। হঠাৎ একদিন একটা নম্বর থেকে টেক্সট আসে কেমন আছেন বলে, সে তেমন কোনো পাত্তা দিলোনা, কিন্তু তারপরও আবার পরের দিন টেক্সট আসতে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে সেই নম্বরের অপরিচিত একজনের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে উঠে, সে শুধু জানতে পারে সেই মানুষটা একটা মেয়ে মানুষ। আর কিছুনা। এভাবে তার দিন ভালোই যাচ্ছিল, এক সময় সে তার মালিকের সাথে শেয়ারে ব্যবসা করতে লাগলো। তার উন্নতি দেখে তার মালিক অনেক খুশি হলো।

তারপর একদিন তার মালিক তার সাথে দেখা করে বললো তুষার তোমার সাফল্য দেখে আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছি তোমাকে আমি একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই। তুষার বললো সবই আপনার দয়া আর আশীর্বাদ স্যার, আপনি আমাকে এত সুযোগ করে দিয়েছেন তাই আমি এতটুকু করতে সমর্থ হয়েছি। তার মালিক বললো তুষার আগামীকাল আমি আমার বাড়িতে একটা পার্টির আয়োজন করতে চাই, সেখানে আমাদের রেস্টুরেন্ট এর সকল কর্মচারী থাকবে, আর তোমার মা বোনকে ও সাথে নিয়ে আসবে। তুষার বললো ঠিক আছে স্যার।

পরের দিন তুষার তার মা বোনকে সাথে নিয়ে গেলো তার মালিকের বাসায়, রেস্টুরেন্ট এর সকল কর্মচারি আজ এখানে উপস্থিত, রেস্টুরেন্ট আজ বন্ধ, সবাই আজ খুব এক্সাইটেড, তুষার আসলে ভাবতেই পারছে না সত্যি তার জন্য আজ কি অপেক্ষা করছে। তুষার অনেকটা অবাক! আজ কি সত্যি তার জন্য এত আয়োজন? সে এমন কি করেছে এই ব্যবসার জন্য, তার কর্তব্যটুকু সে সঠিকভাবে পালন করেছে। সবাই এসে তুষার এবং তার মা বোনের সাথে দেখা করছে সুন্দরভাবে কথা বলছে। এর মধ্যে তুষারের চোখে পড়লো সুন্দর সেই চোখদুটো, আজ অনেক সুন্দর করে সেজেছে মেয়েটি, সুন্দর একটা শাড়ি পড়েছে, অসম্ভব রকম সুন্দর লাগছে তিন্নিকে, তুষার তাকে একনজর দেখেই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তিন্নি ঠিক তাদের দিকেই আসছে। তুষার কিছু বলার আগেই তিন্নি বললো কেমন আছেন? এটা আপনার মা আর বোন বুঝি? কই পরিচয় করিয়ে দিবেন না? বলে সে একাই তুষারের মা আর বেনের সাথে গল্প শুরু করে দিল। তুষার শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, এত ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে এত বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে?

যা হোক, সবার মাঝে তুষারের বস মানে তিন্নির বাবা আসলো, সবার সামনে তিনি বললেন আজকে আসলে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সবাইকে ডেকেছি, আজ আমি তুষারকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই। তুষারের মনের মধ্যে কেমন যেন অস্থির লাগছে, সে বুঝতে পারছেনা আসলে তিনি কি করতে যাচ্ছেন, সে শুধু অপেক্ষা করছে। তারপর উনি বললেন তুষারকে আমি আমার রেস্টুরেন্টে যেদিন কাজ

দিয়েছিলাম আমার একটা উদ্দেশ্য ছিলো, সেটা হয়তো তুষার জানে না, তুষার তোমার মনে আছে তুমি একটা খাম পেয়েছিলে আর সেখানে একটা মোবাইল নাম্বার দেখে কল করেছিলে? তুষার অবাক হচ্ছিলো সে কথা উনি কিভাবে জানেন? তুষার বললো হ্যাঁ। সেই খামটা কে রেখেছিলো সেটা কি কখনো জানতে পেরেছিলে? তুষার বললো না স্যার, ওটা আমি রেখেছিলাম, কারণ আমি চেয়েছিলাম যে আমি তোমাকে একটা নিশানা দিবো যেটাকে অনুসরণ করে তুমি নিজের চেষ্টায় নিজে বড় হও। কারণ আমি তোমার মাঝে এমন একটা সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছিলো তুমি জীবনে কিছু করতে পারবে, তুষার তোমার মনে আছে খামের ভিতরে কাগজটায় একটা লেখা ছিলো? তুষার বললো হ্যাঁ মনে আছে, লেখা ছিলো ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম, এবং সে কথাটাই আমাকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করেছে।

আসলে তুমি সত্যি ওই কথাটা তোমার জীবনে কাজে লাগিয়েছো তাই তুমি এতদূর আসতে পেরেছো এবং আজকে অবাক করা এমন একটা কথা বলতে যাব যার জন্য হয়তো কেউই প্রস্তুত না, আজকে তুষারের মতো আরেকটি মানুষও ঠিক একইভাবে সে যখন সুযোগ পেয়েছে কিছু করবার সেও তার সময় অপচয় করেনি, এবং নিজেকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করে নিজেকে সফল প্রমাণ করেছে আর সেটা কে, কেউ কি অনুমান করতে পারবে? তুষার শুধু অবাকই হচ্ছিলো।

এবার আপনাদের মাঝে সেই সফল ব্যক্তিকে নিয়ে আসবো, তবে তার আগে আমি তুষারের মা বোন আর তুষারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, তোমাদের সাথে আমি আসলে কিছুটা অন্যায় করেছি, পারলে আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও। তুষার বললো কি বলছেন স্যার? তিন্নির বাবা এবার একজনকে ভিতর থেকে নিয়ে আসলো যা দেখার জন্য তুষার কোনভাবেই প্রস্তুত ছিলোনা। তুষার দেখতে পেলো তার বাবাকে, এত সুন্দর স্বাস্থ্য এত সুন্দর পোশাকে, তুষার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেনা।

তুষারের বোন তমা ততক্ষণে বাবা বাবা বলে চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরলো, তুষারের মা অঝোরে কাঁদতে লাগল। তুষার যেন বোবা হয়ে গেল। সে ভাবছে এসব কি হচ্ছে? তুষার এতক্ষণে তার বাবার কাছে গিয়ে বললো বাবা তুমি? এতদিন কোথায় ছিলে? আমরা তোমাকে কত খুঁজেছি জানো? এমন করলে কেনো আমাদের সাথে। কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে, তুষারের বস বললো আমি আসলে সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তুষার জানি তুমি বা তোমার মা বোন সবাই হয়তো আমার উপর রাগ করে আছো, কিন্তু আসলে তোমার বাবার আমার ছোট বেলার বন্ধু, অনেক বছর পরে ছোটবেলার বন্ধুকে যখন দেখেছিলাম খুবই হতাশ অবস্থায় এবং তোমার বাবাকেও আমি ঠিক একই ভাবে খামের মধ্যে লিখে দিয়েছিলাম ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম, এবং তোমার বাবাও কিন্তু আমাকে ফোন করে ঠিক তোমার মতো। তখনই ভাবলাম ও পারবে ওর জীবনের পরিবর্তন করতে এবং সে আমার কাছে আসলে আমি তাকে আমার মালেশিয়াতে যে ব্যবসা আছে সেখানে পাঠিয়েছিলাম তোমার বাবাও তার মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে সেখানে অনেক উন্নতি করেছে, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে ঠিকই কিন্তু সে কয়েক বছরে অনেক টাকা পয়সা জমিয়েছে তোমাদের সংসারের অভাব দূর করার জন্য এবং আমি বলেছিলাম তোমার বাবাকে আমি তোমার ছেলেকে একদিন প্রতিষ্ঠিত করে তুলবো। সে আমাকে বিশ্বাস করেছে এবং নিয়মিত তোমাদের খোঁজখবর নিয়েছে। সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছে এসব ঘটনা দেখে। তুষারের বাবা তাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো এতদিন নিজেকে আঁড়াল করে রাখার জন্য। তারপর তুষারের খুব প্রশংসা করলো তার জীবনকে এত সুন্দর করে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবার জন্য, এবং সংসারের হাল ধরবার জন্য। সবাই একসময় সব অভিমান ভুলে এক হয়ে গেলো। তারপর তিন্নির বাবা বললো এবার সবার সামনে তুষারকে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই, কি তুষার রাখবে তো? তুষার বললো অবশ্যই স্যার বলেন কি করতে হবে? এবার আমি তোমাকে আরো একটা বড় দায়িত্ব দিতে চাই সেটা আশা করি তুমি পালন করবে, কি করবে তো? হ্যাঁ স্যার অবশ্যই। আমি ও তিন্নির মা ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের একমাত্র মেয়ে তিন্নিকে তোমার হাতে তুলে দিব তার সারাজীবনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। তুষারের সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, সে কিছুই বলতে পারছেনা। ঠিক সে সময় সেই অপরিচিত নাম্বার থেকে টেক্সট আসলো কি হলো কিছু বলবে না? চুপ করে আছো কেনো? সে তিন্নির দিকে তাকিয়ে দেখলো সুন্দর দুটো চোখ তার উত্তরের অপেক্ষা করছে, তুষার বুঝতে পারলো সেই অপরিচিত মেয়েটা ছিলো তিন্নি। তখন তুষার তাকে দেখে হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। তিন্নির বাবা বললো কি হলো তুষার? ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম...॥

## বড়দিনের গান

**ইমেল্ডা লিডিয়া গমেজ**

প্রভু তোমারি প্রতিক্ষায় মুখরিত
চারিদিকে,
সাজিয়েছে ধরণী, হাজারো রঙিন
আলোকে।
প্রভু তোমারি ..... (২)
চারিদিকে ঝংকারে, গাইছে তোমারি গান
(২)
করবে প্রণাম যে তোমাকে।
সাজিয়েছে ধরণী হাজার রঙিন
আলোকে।
প্রভু তোমারি ..... (২)
১। রাত্রি কেটে আসবে নতুন ভোর,
প্রভু তোমার আগমনে। (২)
উল্লাসে মাত সবে, জয় যিশু, যিশু বলে।
ডাক তারে খুলে মন প্রাণে।
দিকে দিকে ঝংকারে ..... (২)
করবে .... তোমাকে।
সাজিয়েছে ধরণী ..... আলোকে। (২)
২। মিটিমিটি জ্বলবে তারা গগনে,
বেথলেহেমের সেই আকাশ পানে। (২)
নতুন ভূবনে নতুন প্রতিক্ষায় বসে,
তোমারি আশায়। (২)
দ্বীপ জ্বেলে যায় সবে, আনন্দ নিয়ে বুকে,
তাই স্বাগত জানাই। (২)
চারিদিকে .. গান। (২)
সাজিয়েছে .. আলোকে। (২)

# ফুলতলা বস্তি

**মিল্টন রোজারিও**

আদমজী ফুটবল খেলার মাঠটি এক সময় খুব নাম করা খেলার মাঠ ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে এই মাঠে দেশের অনেক বড় বড় নাম করা খেলোয়াড়রা এসে খেলে গেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর আদমজী পাটকলটি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় ফুটবল খেলা। এখন আদমজী ফুটবল খেলার মাঠে আর ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় না। স্থানীয় ছেলেরা মাঠের মাঝখানে ক্রিকেট পিচ বানিয়ে ক্রিকেট খেলে।

আদমজী পাটকলে আঠারোগ্রাম অঞ্চলের বহু লোক বিভিন্ন কর্মে জড়িত ছিলেন। এই কর্মের একটি বিশেষ অংশ ছিল আদমজী ফুটবল টিম। সেই টিমে আঠারোগ্রামের বেশ কয়েকজন নাম করা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তাদের মধ্যে ক্যান গমেজ, পরিমল গমেজ, অনিল গমেজ, বাবুল রোজারিও ছিলেন অন্যতম। এই সব ফুটবল খেলোয়াড়েরা নিজের এলাকায় যেমন নাম কামিয়ে ছিলেন, ঠিক তেমনি আদমজী ফুটবল টিমেও ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। ফুটবল খেলার পাশাপাশি তারা কেউ পাটকলের অফিসে, কেউ কারখানায়ও কাজ করতেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আদমজী পাটকল কারখানাটি খোলা ছিল। কারণ, এই পাটকল মিলটি পরিচালনা করতেন পাকিস্তানীরা। কাজেই আদমজী পাটকলে যারা কাজ করতেন, তাদের কোন ছুটি ছিল না। রোজই তাদের কাজে আসতে হতো। রবিবার ছিল তখন সপ্তাহের ছুটি দিন। অনেকে শনিবার অর্ধ বেলা কাজ সেরে গ্রামের বাড়ীতে চলে যেতেন। আবার সোমবার কাক ডাকা ভোরে কর্মের উদ্দেশে আদমজী কারখানায় চলে আসতেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত ভয়-ভীতির মধ্যেও অনেকে কর্মস্থল থেকে বাড়ীতে মা-বাবা, ছোট ভাইবোনদের দেখতে গ্রামের বাড়ীতে চলে আসতেন। অনিল গমেজ প্রায় প্রতি শনিবার গ্রামের বাড়ীতে আসতেন। আবার সোমবার ভোরে আদমজী পাটকলে এসে কাজে যোগ দিতেন। দেশের মানুষজন জীবিকার তাগিদে তখনও ভয়-ভীতির মধ্যে বড় বড় শহরে, গঞ্জে, অফিস-আদালতে, কল-কারখানায় কাজ করছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই সব কর্মজীবি মানুষদের নিরাপত্তার জন্য আইডেন্টিটি কার্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে মানুষজন ঠিক মত তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় রাস্তা-ঘাটে পাক মিলিটারীরা ধরলে এই কার্ড দেখিয়ে বাঁচতে পারতেন। পাক মিলিশিয়া বাহিনী রাস্তা-ঘাটে মানুষজনকে ধরেই জিজ্ঞেস করতো, আপ কি পাস ডান্ডি কার্ড হ্যায়? পাকিস্তান সরকার এই কার্ড দিয়ে সারা বিশ্ববাসিকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্থানে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে না। এমনকি মুক্তিযুদ্ধও হচ্ছে না। সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে চলছে।

এক শনিবার অর্ধ বেলা আদমজী অফিসে কাজ সেরে অনিল গমেজ নিয়ম মাফিক বাড়ীতে আসলেন মা ভাইবোনদের দেখতে। যথারীতি রবিবার ভোরে আবার কর্মস্থল আদমজীর উদ্দেশে চলেও গেলেন। কিন্তু, ক'দিন পর তার আর কোন খোঁজ খবর কেউ দিতে পারলো না। তিনি কোথায় গেছেন বা আছেন! কেউ কেউ ভেবেছেন অনিল বাড়ীতে গেছেন হয়তো বাড়ীতেই আছেন। আবার কেহ কেউ ভেবেছেন তিনি তার কর্মস্থলেই আছেন। এই ভাবেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন আদমজীর চির পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, নিজের আত্মীয়-পরিজন এবং আঠারোগ্রামের সকল মানুষের কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত তার কোন হদিস কেউ দিতে পারলো না।

এশিয়ার ডান্ডি বলে খ্যাত ছিল নারায়ণগঞ্জের আদমজী পাটকল কারখানাটি। সারা বিশ্বে এর নাম ছড়িয়ে ছিল বিখ্যাত পাটকল হিসাবে। কারখানার শ্রমিকদের বসবাসের জন্য আদমজী নগরেই শ্রেণি ভেদে বিভিন্ন আবাসন এবং বস্তি ছিল। বস্তিগুলোও ছিল বিভিন্ন ভাগে। যেমন বিহারী বস্তি, নোয়াখালী বস্তি, কুমিল্লা বস্তি, ফুলতলা বস্তি ইত্যাদি। মাঠের পাশে ছিল বেশ বড় বড় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। বিশেষ করে কৃষ্ণচুড়া ফুলের গাছ। আর এই কৃষ্ণচুড়া ফুলগাছের জন্যই একটি বস্তির নাম করণ করা হয়েছিল ফুলতলা বস্তি। ফুটবল খেলার মাঠের পাশেই ছিল ফুলতলা বস্তিটি। ঘিঞ্চি ঘিঞ্চি ঘর ভর্তি বস্তিতে ছিল শ্রমিকদের বসবাস। পাটকলের শ্রমিকরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই বস্তিতে বসবাস করতো। তবে কেউ কেউ যার যার সম্প্রদায় নিয়ে এক সাথে পাশাপাশি বসবাস করতে চেষ্টা করতো। ফুলতলা বস্তিতে বেশ কয়েকেটি খ্রিস্টান পরিবারও ছিল। অনিল গমেজ এবং তার সহ খ্রিস্টান ফুটবল খেলোয়ার বন্ধুরা মাঝে মাঝে সেই সব খ্রিস্টান পরিবারে বেড়াতে যেতেন।

ফরিদপুরের মাইকেল রয় ছিলেন পাটকলের একজন দক্ষ শ্রমিক। তিনি সেই ফুলতলা বস্তিতে স্ত্রী যোয়ানা এবং বারো বৎসরের এক ছেলে আর দশ বৎসরের এক মেয়ে নিয়ে বসবাস করতেন। অনিল গমেজের সাথে ছিল তার খুব ভালো সম্পর্ক। এক কথায় অনিল গমেজকে মাইকেল রয় বড় ভাইয়ের মত দেখতেন। অনিল গমেজ মাঝে মাঝে মাইকেলের ছেলে জেমস ও মেয়ে জাসিন্তাকে পড়াতেন। সন্ধ্যায় তারা মাইকেল রয়ের বাসায় বসে গান বাজনার আসর জমাতেন। বস্তির লোকজন ও আসতো তাদের গান-বাজনা শুনতে। অনিল গমেজ সাধারণ গানের চেয়ে ধর্মীয় গানই বেশী গাইতেন। বস্তির লোকজন খুব মনোযোগ দিয়ে সেই সব গান শুনতেন। একদিন গান গাইতে গাইতে অনিল গমেজ বলেন, আজ আমার লেখা এবং সুর করা একটি গান আপনাদের গেয়ে শোনাবো। উপস্থিত সবাই খুব খুশী হলো কথাটি শুনে। মাইকেল বললো, দাদা গানটি এখনই কি আমাদের গেয়ে শোনাবেন? অনিল গমেজ অত্যন্ত দরদ ভরা কণ্ঠে, অন্তর থেকে গানটি তখন তাদের গেয়ে শোনালেন।

"প্রভু হে তোমার সিংহদ্বারে, মৃদু চরণে
এসেছি আজি অর্ঘ্যদামে।"

গানটি শুনে উপস্থিত সবাই খুব খুশী হলো। এরপর যখনই গানের আসর বসতো, তখনই এই গানটি গাইবার অনুরোধ করতো লোকজন। অনিল গমেজ অন্তর থেকে তখন গানটি গেয়ে শোনাতেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মাইকেল রয় তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে গ্রামের বাড়ী ফরিদপুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কারখানা খোলা থাকায় তিনি গ্রামে যেতে পারেন নাই। সেই বস্তি ঘরেই থাকতেন। স্বাধীনতার পর অনেকে ফিরে এসেছিল; কিন্তু, ফিরে আসে নাই অনিল



নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন
সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন



৮১ পথ চলার গৌরবময় বছর

গমেজ। ফিরে আসে নাই মাইকেল রয় এবং বস্তির আরো অনেক লোকজন।

ফুলতলা বস্তি এখন আর সেই আগের মত নাই। আদমজীর পাটকলও বন্ধ হয়ে গেছে। মাইকেল রয়ের ছেলে জেমস এবং মেয়ে জাসিন্তা এখন বড় হয়েছে। জেমস একদিন মাকে বলে আদমজী নগরে আসে। পরিচিত অনেকের সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়। মাইকেল রয়ের এক কলিগ এবং ঘনিষ্ট বন্ধু সালাম কাকার বাসায় এসে ওঠে সে। সালাম কাকার সাথে কথা বলে তার একটি টিনের বাসায় তারা বসবাস করতে শুরু করে। আদমজী নগর যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা কাঁটিয়ে আবার নব চেতনায় জেগে উঠেছে। সবাই নতুন করে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

মাইকেল রয়ের স্ত্রী যোয়ানা এখন একটি গার্মেন্টসে কাজ করছে। জেমস ভাল একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান হয়েছে। জাসিন্তা বাসার আশেপাশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায়, গান শেখায়। এখনও তাদের ঘরে গানের আসর বসে। ধর্মীয় গান হয়। গান শুনতে এখন আর আগের মত মানুষজন তাদের ঘরে আসে না। জাসিন্তার ছাত্রছাত্রীরাই শ্রোতা। জাসিন্তা বলে, অনিল কাকার গানগুলো গাইতে আমার খুব ভালো লাগে। তোমরা তো কেউ আমার অনিল কাকাকে দেখ নাই। কাকা আমাদের পরিবারেরই একজন ছিলেন। আমাকে খুব আদর করতেন। কাকাই আমাকে গান শিখেয়েছেন। হারমোনিয়াম বাজাতে শিখিয়েছেন। এই কথা বলতে বলতে তার চোখে পানি এসে পড়ে। গলাটা কেমন জানি একটু ধরে আসে। নিজেকে আবার স্বাভাবিক করে নিয়ে বলতে থাকে, গ্রামে গেলে কাকা আমাদের জন্য সব সময় কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। বিশেষ করে বান্দুরার চারা বিস্কুট, চানাচুর আর রসগোল্লা। এত মজার বিস্কুট আর মিষ্টি আমি কোথায়ও খাই নাই। বড়দিনে কাকাদের অঞ্চলে অনেক মজার মজার পিঠা বানায়। কাকা আমাদের জন্য সেই সব পিঠা নিয়ে আসতেন। আমার একটি পিঠার নাম মনে আছে। আমার খুব প্রিয় পিঠা। সেই পিঠার নাম 'কাঁটাকুলি'। দেখতে ছোট হলেও অনেকটা অর্ধ চন্দ্রের মত। খেতে খুব মজা।

ডিসেম্বর মাস এলেই কাকার কথা খুব মনে পড়ে। কাকার মুখে শুনেছি, তিনি নাটকে ভাল অভিনয় করতেন। গান বাজনায় সেরা ছিলেন সেটা তো আমরা নিজেরাই দেখেছি। অনিল কাকাকে কোন দিন ভুলতে পারবো না আমরা।

মহান বিজয় দিবসে আমরা সবাই এবার অনিল কাকা আর বাবার স্মরণে এক সাথে স্মৃতিসৌধ যাবো। বড় দুইটি মালা গেঁথে মিনারে কাকা আর বাবার নামে পড়িয়ে দেব। কি তোমরা সবাই যাবে তো আমার সাথে? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই এক সাথে বলে ওঠে, হ্যাঁ আমরা সবাই যাবো ফুল নিয়ে মিনারে ফুল দিতে॥

# দশটি বিশ শব্দের গল্প

**খোকন কোড়ায়া**

**এক**

প্রেমিকার বাবার প্রশ্ন- বাবার পরিচয় কি?
- বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা।
- এটা পরিচয় হলো!
- একজন মুক্তিযোদ্ধার অন্য কোন পরিচয় লাগে না আঙ্কেল।

**দুই**

বাবার আনা পিজ্জা তুহিনের গলা দিয়ে নামছে না। পরপর দুদিন ও দেখেছে, বাবা লাঞ্চ টাইমে ফুটপাতের দোকানে কলা রুটি খাচ্ছে।

**তিন**

সড়ক দুর্ঘটনা, জানালার পাশে বসা মা গুরুতর আহত। জ্ঞান হারানোর আগে মা শুধু একটি বাক্যই বললেন, খোকা, খুব ব্যথা পেয়েছিস?

**চার**

এই প্রথম রাতুলকে আনতে এয়ারপোর্টে যায়নি প্রিয়তি। স্বজনে পূর্ণ অথচ নিস্তব্ধ বাড়িতে সাদা পাথর হয়ে বসে আছে বাক্সবন্দি রাতুলের অপেক্ষায়।

**পাঁচ**

আকমল সাহেবের মন খারাপ, আজ ঈদ অথচ তার স্ত্রী করোনায় আক্রান্ত। হঠাৎ ইন্টারকমে রোজারিও সাহেব, ভাই দুপুরে আপনাদের খাবার পাঠাচ্ছি।

**ছয়**

ছেলেটি একটি চুম্বন চেয়েছিলো। মেয়েটি বলেছিলো, এরপর যেদিন দেখা হবে সেদিন। আর দেখা হয়নি। করোনার নীল চুম্বনে ছেলেটি চির নিদ্রায়।

**সাত**

- এখানে ঘুরঘুর করেন কেন?
- তোমাকে দেখতে আসি।
- ছিঃ, আপনি বাবার বয়সী!

আমার মেয়েটা ছিলো অবিকল তোমার মত, মেরেই ফেললো জানোয়ারেরা!

**আট**

রাত এগারোটায় মায়ের ঔষধ কিনতে মেয়েটি রাস্তায়। বখাটেরা ঘিরে ধরলো। মেয়েটি বললো, আমার করোনা, হাসপাতালে যাবো। মুহূর্তে কেটে পড়লো সবাই।

**নয়**

অবশেষে ওরা পালালো। মেয়েটি বললো, হোটেলে কেন, আমরা বিয়ে করবোনা? ছেলেটি বললো, কাল। সকালে দেরিতে ঘুম ভাঙ্গে মেয়েটির। ছেলেটি উধাও।

**দশ**

হাসপাতালের আইসিইউতে ডব্লিউ সাহেব স্বপ্ন দেখলেন, একটি মনোমুগ্ধকর বাগানে বসে আছেন তিনি, পাশে শান্ত নদী। তিনি স্বপ্নের ভেতরেই থেকে গেলেন!

# রহস্যমানব

**শ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন**

একটা মানুষ কালিসন্ধ্যায় গালারপাড় ডান দিকে রেখে দক্ষিণে নেমে আসে। দূর থেকে মনে হয় জোব্বাজাব্বা দরবেশি পোশাক তার গায়ে। মানুষটা ফকির বাড়ির জঙ্গলের কাছারি দিয়ে ভূতেরবান্ধের দিকে এগিয়ে যায়।

চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। কেটুনের জঙ্গলে নয়টা শিয়াল লাফিয়ে লাফিয়ে গিরিশের ঠুঁটায় এসে দাঁড়ায়। পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বুড়ো শিয়াল হুক্কাহুয়া ডাক ছাড়ে। সাথে বুড়ি শিয়াল চিকন সুরে তাল মিলায়। অন্য সাতটা যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী স্বামী স্ত্রী ও কুটুম্ব শিয়াল এক্কাদোক্কা খেলে খালি মাঠে। এখন ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগীর বড়ই অভাব দেশে।

ভূতেরবান্ধের মানুষেরা থামে। দক্ষিণদিক থেকে পাড়াবর্তা টাহরদিয়ার কাছার ঘেঁষে আরও ছয়টা মানুষের পা এগিয়ে যায় উত্তর দিকে। মাল্লার দক্ষিণপাড়ার স্থানীয় তিনটা কুকুর ঘেঁউঘেউ করতে থাকে।

সন্ধ্যার পর রাতের বেলা, বিলে ধানগাছের মাতাল দোলা। দখিনা বাতাসে নেশার মাদকতা তেড়ে আসে হুড়মুড়িয়ে। উত্তর দিক থেকে ছায়ামানব স্থির দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ থেকে ছয়টা পা একত্রিত হয়। কুঁতকুঁত হাসির শব্দ। কুকুরগুলো আবার খেঁকিয়ে ওঠে।

তারপর ছয়টা পায়ের ছায়া ও দীঘল মানুষের প্রতিবিম্ব প্রলম্বিত হয় বিলের মাঝখানটাতে। এমন একটা সময় ছিল উনিশ শ' চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের বছর। বর্ষাকালে এখান দিয়ে মাঝরাতে ডাকাতদের চিকন চিকন ডিঙ্গিনৌকা বিলের পানি কেটে সাঁসাঁ ছুটে যেত নাক বরাবর পশ্চিমে নাওটানার খালের দিকে। ঐতিহাসিক মোঘল আমলের সে খাল কালেরসাক্ষী হয়ে আছে। এখন তো এখানে ভাওয়ালের এ দিকটাতে ইতিহাস যেন নির্বাক হয়ে আছে হোঁচট খেয়ে।

জোব্বাজাব্বা পরা দীঘল মানুষ ছয়টি পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ওদিকে মাল্লা। খিকখিক করে হাসে ছয় পায়া তিনটা রহস্য প্রাণী। নাকি নাঁকি শব্দ সে হাসির। ওদের ইচ্ছে, মাল্টার দিকেই যাবে তারা। কিছু ঝড়ঝঞ্ঝা তাণ্ডব ঘটাবে। আকাশে এমন সময় বিদ্যুৎ চমকায়। গ্রামের উপকূলে বাঁশঝাড়, কড়ই আর তাল গাছের মাথা নড়ে ওঠে প্রতিবাদে। গিরিশের ঠুঁটায় দাঁড়িয়ে শিয়াল বাহিনী তা নিরীক্ষণ করে লম্বা সময় নিয়ে।

ঠিক এমন সময় মধ্যরাতের ভগ্ন আকাশে মাল্লার সকল স্বর্গীয় আত্মারা ক্রমে জড়ো হন। তাঁরা সংখ্যায় অনেক। অসংখ্য। উত্তরে দক্ষিণ মঠবাড়ি, পশ্চিমে টাহরদিয়া, দক্ষিণে পাড়াবর্তা আর পূর্বে কেটুন ইত্যকার মানচিত্রের সব সরল রৈখিক সীমানার ভিতরে আদিকালের মাল্লার অধিবাসি ও অভিবাসি সকল বিদেহী আত্মা এসে সমবেত হন। তাঁরা মিছিল করেন। শোভাযাত্রা করে নিচে নামেন। কণ্ঠে প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র অনবরত উচ্চারিত হচ্ছে দুর্দমনীয় ঐক্যতানে। ছয়টি পা একসময় ছড়িয়ে পড়ে। জোব্বাজাব্বা পরা মানুষটা খণ্ডিত দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন পশ্চিম পাড়ে নীরব সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়িয়ে থাকা শিয়ালবাহিনী তাদের নাগালে পেয়ে যায় খণ্ডিত টুকরাগুলো। অনেক যুগ ধরেই তারা অভুক্ত আছে। এবার শিকার হাতছাড়া হয় কীভাবে?

আর্তচিৎকার। অশুভ রহস্যপ্রাণীর প্রণিপাত হল। এখন রক্তে রঞ্জিত হয় সাতটা শিয়ালের দাঁত, জিভ, নাক ইত্যাদি। একসময় বিলের উপরের আকাশ খোলাসা হয়ে যায়। প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্রও থেমে যায়।

'হৃদয়ে এসো আত্মা তুমি, দাও গো তোমার আলো। অশুচি যত আছে প্রাণে সব তুমি আজ জ্বালো!' সঙ্গীতের অলৌকিক মূর্ছনার সাথে আচম্বিতে বৃষ্টি নেমে আসে পুরো মানচিত্র জেঁকে। রহস্যমানবের খবিশ রক্ত, নোনা লাশ সাথে সবগুলো শিয়াল ধুয়েমুছে যায় নাওটানার খালে। একসময় নাকি এখান দিয়ে বৈদ্যেরবাজার থেকে কামান তৈরি হয়ে টানা নাও মারফৎ চালান যেত সোনারগাঁয়ে। যত্রতত্র অন্য কোথাও সংরক্ষিত ইতিহাসের মলিন পৃষ্ঠা কী জানি কী বলে। তবে এটা ঠিক, ইতিহাস বলে, ধার্মিকপ্রাণ সিদ্ধমানব জগতের প্রারম্ভ থেকে রোজহাসর পর্যন্ত সমস্ত আপদ বালাই থেকে পাপময় সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। কারণ তাঁরা সিদ্ধমানব। স্বর্গোদ্যানের স্থায়ী বাসিন্দা।

অন্ততঃ ঘটনায় বর্ণিত ঘোরতর অভিশপ্ত রাত্রির উদ্ধারপর্বের চিত্রায়ণ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। এ সমস্ত ঘটনার মাহাত্ম্য মাল্টার কেউ বুঝলো। কেউ বুঝলোনা। এমনি করে অনেক বালামুসিবত থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এই আমাদের সময়কার এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মও তাই করবেন। ইতিহাস এমনই বলে।

বর্ণিত ঘটনার সব তথ্য উপাত্ত, চরিত্র বাস্তবিকই বাউকুড়ালিচক্রের মত। এ চক্র শুধু ধূলি উড়ায়। অদৃশ্য প্রাণঘাতী জীবাণু বয়ে নিয়ে আসে। পিছন মুচড়ে রেখে যায় গাছপালা, ঘরবাড়ি, ফসলের সব সবুজ আর ইতস্তত নানা বয়সী মানুষের প্রাণহীন দেহ। তারপর একসময় শূন্যে মিলিয়ে যায়। বিধ্বস্ত পৃথিবী, সমূহ প্রাণী পড়ে থাকে আস্তাকুঁড়ে। তাই আমাদের সকলকে এই রহস্যময় মানব থেকে সাবধান থাকতে হবে। প্রার্থনায় আরো বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হবে। তারা প্রলয়ের মুখে নোহের নৌকায় সওয়ার হয়ে আবার আমাদের উদ্ধার করতে আসবেন॥

## ছোট্ট গোশালয়

**নোয়েল গমেজ**

বেথলেহেমের সেই ছোট্ট গোশালয়,
জন্ম নিলেন এক শিশু।
নাম রাখা হলো তাঁর যিশু।
মা মারীয়ার কোলে
রাজা হয়ে যিনি আছেন শুয়ে
পিতা যোসেফ দেখেন তাহা
আনন্দিত হয়ে।
মেষ পালকগণ তাঁর জয়গান গায়
পণ্ডিতগণ তাঁর চরণে রাখেন দামী
উপহার,
আকাশে বাতাসে বাজে নব ছন্দ।
অন্ধকার দূর করেন যিনি
আলোকিত করেন জীর্ণ কুটির,
তিনি আমাদের মুক্তিদাতা,
সেই প্রভু যিশুখ্রিস্ট॥



নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন
সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন



৮১ পথ চলার গৌরবময় বছর

# শ্রদ্ধেয় রুবেন গমেজ- একজন স্পষ্টবাদী ও যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন



**ড. আলো ডি'রোজারিও**

১। আমাকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমার্ধে কারিতাসের সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়। আমি সেসময় বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনে শ্রদ্ধেয় ফাদার টিম সিএসসি-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করতাম। কারিতাসের সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার সুবাদে তখন আমার প্রথমবারের মতো সুযোগ হয় এই সংস্থার দর্শন, লক্ষ্য ও কাজকর্মসহ অন্যান্য বিষয়ে জানতে। আমি নিয়মিত পেতে থাকি- কারিতাসের বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজলেটার, বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী, বড়দিনের কার্ড, গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগদান, পদোন্নতি ও বদলীর খবরাখবর। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে শেষার্ধে পড়ার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবার পরেও আমার নিকট কারিতাসের সব প্রতিবেদন, কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি নিয়মিত পাঠানো হতো। তাই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালেই জানতে পেরেছিলাম- শ্রদ্ধেয় রুবেন গমেজ কারিতাস খুলনার আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব প্রায় চার বছর অত্যন্ত সফলভাবে পালন শেষে পদোন্নতি পেয়ে কারিতাসের কেন্দ্রীয় অফিস, ঢাকাতে কল্যাণ পরিচালক পদে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে যোগ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশেষে দেশে ফিরে আসার পর আমাকে বলা হয়- কারিতাসের কেন্দ্রীয় অফিস, ঢাকাতে উন্নয়ন বিভাগে সহকারী উন্নয়ন পরিচালক পদে যোগ দিতে। কারিতাসের সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ হতে ইস্তফা দিয়ে আমি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাসে কাজ করা শুরু করি। কারিতাসে যোগদানের পর থেকে শ্রদ্ধেয় রুবেন গমেজকে দূর হতে দেখতাম। তাঁর জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার কথা শোনতাম। সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলে নমস্কার দিতাম। 'রুবেন স্যার' বলে সম্বোধন করতাম। কথাবার্তা খুব বেশী হতো না। তা নানাকারণে। বয়সের ব্যবধান অন্যতম কারণ ছিল।

২। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ দিয়ে কারিতাসের শুরু হলেও কয়েক বছর পর কারিতাসের ব্যাপক কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে কল্যাণ ও উন্নয়ন নামে দু'টি প্রধান বিভাগ করা হয়। এই দুই বিভাগকে সহায়তা দিতে ছিল প্রশাসন বিভাগ নামে তৃতীয় আরো একটি বিভাগ। তো আমি কারিতাসে যোগ দিয়ে দেখলাম- কল্যাণ ও উন্নয়ন এই দুই বিভাগের মধ্যে সে কী প্রতিযোগিতা! বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা- ভালো কাজ করার প্রতিযোগিতা, সভা-সেমিনার-কর্মশালায় ভালো খাবার আয়োজন করার প্রতিযোগিতা, কথা-বার্তায় একে অপরকে ঘায়েল করার প্রতিযোগিতা। সভা-সেমিনার-কর্মশালায় ভালো খাবার আয়োজনে কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক একটু বেশী বেশী খরচ করার বিষয়টা একদিন কথায় কথায় শ্রদ্ধেয় রুবেন স্যারের সাথে আলাপে তুললাম। আমার উদ্বেগের কথা জেনে তিনি বললেন, "ছেলে-মেয়েগুলো দিন-রাত পরিশ্রম করে। ছুটির দিনেও কাজ করে। যারা স্থায়ী কর্মী, তাদের বেতন খুব বেশী না। সব কর্মীর নিয়োগ স্থায়ী না। অনেকের আবার সারা বছর কাজ থাকে না, বছরে ছয়মাস-নয়মাস কাজ করে সর্বসাকুল্যে চার/পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতন তারা পায়। তাই বছরে দুই-একবার ভালো খাবার তাদের পাওনা। এতে আমার কল্যাণ বিভাগের কর্মীদের মনে সন্তুষ্টি বাড়ে। যদি আপনি আমার জায়গায় কাজ করতেন, তবে বিষয়টা বুঝতে পারতেন।" সেদিন আমি রুবেন স্যারের ব্যাখ্যায় খুশী হইনি। পরবর্তীতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ হতে কল্যাণ বিভাগে কাজ করতে করতে উপলব্ধি করেছি- তাঁর ব্যাখ্যার বাস্তবতা ও প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তা।

৩। উনিশ' পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে পড়ার জন্যে আমি ইংল্যান্ডে যাই। ফিরি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। যখন ইংল্যান্ড যাই, তখন কাজ করতাম কারিতাসের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিডিআই-তে, সহকারী পরিচালক হিসেবে। পড়াশেষে দেশে ফিরলে আমাকে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন' বিভাগের। নবগঠিত এই বিভাগের আওতায় আসে কল্যাণ বিভাগের সবকয়টি প্রকল্প ও উন্নয়ন বিভাগের আট-নয়টি প্রকল্প। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সিডিআই-তে বদলীর আগে উন্নয়ন বিভাগে কাজ করতাম বিধায় এই বিভাগ থেকে পাওয়া প্রকল্পগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ছিল। কল্যাণ বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। তাতে তেমন অসুবিধায় পড়িনি। শ্রদ্ধেয় রুবেন স্যার ছিলেন তো। তিনি আমাকে সবকিছু খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা কয়েক সপ্তাহ এক সাথে এক কক্ষে অফিস করেছি। শ্রদ্ধেয় রুবেন স্যার প্রথমে ধারণা দিয়েছিলেন কল্যাণ বিভাগের প্রতিজন কর্মকর্তা ও কর্মী সম্পর্কে- কে কে নিজ দায়িত্বে কাজ করেন, কে কে কাজ করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করেন এবং তাতে ভুল করে বিপত্তি ঘটাতে পারেন, কার কার পেছনে কড়া নজর না রাখলে সময়মতো কাজ পাওয়া যায় না- এই জাতীয় অনেক কিছু। প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মীদের পারিবারিক খবরাখবরও বললেন। আমি অবাক হলাম তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপ্তি দেখে। কর্মকর্তা ও কর্মীদের পারিবারিক খবরাখবর বলার সময় বললেন, "কর্মকর্তা ও কর্মীর আচরণ বুঝতে তাদের পরিবার সম্পর্কেও জানতে হয়।" এটা একটি খাঁটি কথা। পরে বহু প্রমাণ পেয়েছি। দ্বিতীয় দফায় তিনি বিশদ ধারণা দিয়েছিলেন কল্যাণ বিভাগের প্রতিটি প্রকল্প সম্পর্কে। প্রতিটি প্রকল্পের পটভূমি থেকে শুরু করে প্রত্যাশিত ফলাফল বলেছেন, প্রকল্পের বিষয়ে দাতাদের মনোভাব ও সুপারিশ কি কি ও কেনো সেসব বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন, সরকারের অনুমোদনের শর্তাবলীও ব্যাখ্যা করেছেন। সবকিছু তিনি বলেছেন ও বুঝিয়েছেন মন ও মাথা থেকে, ফাইলপত্র ছাড়াই। মাঝে-মধ্যে ভারী কথা বাদ দিয়ে হালকা রসালাপও করেছেন। তিনি মজার মজার ঘটনা মনে রাখতেন। জায়গামতো সেসব ঘটনা বলে কঠিন বিষয়টা সহজ করে ফেলতেন। আরো একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার- তিনি উদাহরণ দিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন, কোন্ কোন্ স্পর্শকাতর শব্দ কাকে কাকে লেখা যাবে না বা সামনা-সামনি বলাও যাবে না। রুবেন স্যারের দেয়া নির্দেশনা, উপদেশ ও সতর্কতা আমার দায়িত্বপালনকে সহজ করে দিয়েছিল। আমি শ্রদ্ধাভরে তাঁর সেসব সহায়তার কথা আজো স্মরণ করি।

৪। শ্রদ্ধেয় রুবেন গমেজ কারিতাসের খুলনা আঞ্চলিক অফিসের আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসের কল্যাণ পরিচালক ও সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে দেশের মানুষের জন্যে প্রায় দুই দশকব্যাপী সেবাকাজ করেছেন। একাধিক ভূমিকায় তিনি দেশের বাইরেও সেবার হাত প্রসারিত করেছিলেন।

দেশের বাইরে তিনি কাজ করেছেন উন্নয়নবিদ হিসেবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তিনি ছিলেন বিশ্বের অনেক দেশে সুপরিচিত, বিশেষ করে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ কনফেডারেশনে যার সদস্য বিশ্বের ১৬২টি দেশ। উন্নয়নবিদ হিসেবে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এপিএইচডি-এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে। এপিএইচডি (APHD- Asia Partnership for Human Dvelopment) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়। এশিয়া মহাদেশের অনুন্নত এলাকার বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দিতে এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের ২৪টি দেশের কারিতাস বা অনুরূপ সংস্থা নিয়ে গঠিত এই এপিএইচডি-তে কারিতাস বাংলাদেশ ছিল অন্যতম সদস্য। শুরুতে এপিএইচডি-এর অফিস ছিল অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে, পরে এর অফিস স্থানান্তরিত হয় হংকং-এ, সর্বশেষ এর অফিস ছিল থাইল্যান্ডের ব্যাংককে। বাংলাদেশ হতে মোট আটজন পর্যায়ক্রমে এপিএইচডি-এর নির্বাহী পরিষদে সদস্য ছিলেন; তন্মধ্যে কারিতাসের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক শ্রদ্ধেয় জেফরী এস পেরেরা ছিলেন এই সংস্থার শুরুর বছর ১৯৭৩ হতে ১৯৭৭ পর্যন্ত, মি. রুবেন গমেজ ছিলেন ১৯৮৭ হতে ১৯৯৩ পর্যন্ত। এপিএইচডি-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে শতাধিক এনজিও অর্থ-সহায়তা পায়- প্রধানত সংস্থা শুরু করতে, সংস্থার প্রধানসহ কর্মকর্তা-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে ও জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এপিএইচডি কারিতাস এশিয়ার সাথে একীভূত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের আমন্ত্রণে রুবেন স্যার বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন- তন্মধ্যে পাপুয়া নিউ গিনিতে ও ভারতের গুজরাট রাজ্যের ভুজ শহরে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে নেয়া প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজ উল্লেখযোগ্য।

৫। একবার একটা কাজে নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করা হয়। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে এক কন্ট্রাক্টর কারিতাসের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন। মামলাটি নিষ্পত্তি হবার আগেই রুবেন স্যার অবসরে চলে যান। পরে এই মামলার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি স্পষ্টভাবে আমাকে বলেন,"আমি এই ব্যতিক্রমের বিপক্ষে ছিলাম। আমি সতর্ক করেছিলাম- কি কি জটিলতা পরে হতে পারে। আমার কথা তখন কেউ শোনেননি। আমি মুখে বলেছি। লিখিতভাবেও সাবধান করেছি। এখন এইসব ঝামেলা সামলান। উকিলের সাথে পরামর্শ করে দেখেন কীভাবে সামলানো যায়।" তাঁর নির্দেশ মতোন ফাইল বের করে সব পড়ে আমি অবাক হই স্পষ্টভাবে সত্য বলার তাঁর সাহস দেখে। হাতে লেখা সেসব নোট পড়ে আমি যে কতোটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, লিখে তা বোঝাতে পারবো না। রুবেন স্যার সরকারি চাকুরীর মাধ্যমে দেশসেবা করেছেন। সরাসরি মানবসেবায় নিয়োজিত ছিলেন কারিতাসের মাধ্যমে। তাছাড়া, প্রকল্প কমিটির সদস্য হিসেবে চার্চ অব বাংলাদেশের শিশু-কিশোর-যুবকদের শিক্ষায় ও বোর্ড সদস্য হিসেবে খ্রিস্টিয়ান/কম্যুনিটি হেলথ্ কেয়ার কর্মসূচীর স্বাস্থ্যসেবায় প্রচুর সময় দিয়েছেন। তিনি সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল সোসাইটিরও সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এত কিছু করার পরেও তিনি বলতেন, "যা যা করেছি তা তো জানেনই। আরো বেশী বোধহয় করতে পারতাম।" দীপনাথ চরিত্রের মুখ দিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার মানবজীবন উপন্যাসে বলেছেন,'সব মানুষই এক অসমাপ্ত কাহিনী। কোনো মানুষই তার সব শেষ করে যায় না।' আমার বিশ্বাস- ঈশ্বরের ডাকে রুবেন স্যার আজ বিজয়ী মণ্ডলীর সদস্য। আর আমরা? আমরা রয়ে গেলাম সংগ্রামী মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে। এই আশায় যে, রুবেন স্যারের আদর্শ অনুসরণে আমরাও একদিন বিজয়ী মণ্ডলীর সদস্য হতে পারবো॥


## স্মরণে তোমরা

**প্রয়াত নির্মল গমেজ (কেরানী)**
**জন্ম:** ১০ আগস্ট, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
**মৃত্যু:** ৩১ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**প্রয়াত বার্থা মায়া গমেজ**
**জন্ম:** ১১ নভেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
**মৃত্যু:** ৭ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

**কেরানী বাড়ি, দেওতলা, গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা**

**প্রিয় নানু ভাই ও মায়া (দিদা)**

তোমরা দু'জনেই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলে পরম পিতার কাছে। অনেক অসময়েই তোমরা চলে গেলে। তোমাদের সাথে আরো কত আনন্দময় ও ভালো সময় কাঁটাতে পারতাম আমি ও আমরা সবাই। আমার কত আবদার, কত প্ল্যান সবই বাকী রয়ে গেলো, কোন কিছুই তোমরা পূরণ করে গেলে না।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের দু'জন কেই তাঁর স্বর্গধামে শান্তিতে রাখেন। তোমরা আমাদের সবাইকে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো। আমরা যেন সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাঁটাতে পারি সবসময়।

ওপারে ভালো থেকো তোমরা। I love you & miss you.

**শোকাহত**
**নাতী: জেসিয়াস কল্প রড্রিক্স**
**ও পরিবারবর্গ।**

স্মৃতিকথা

# খ্রিস্টীয় সমাজের নীরব কর্মী, বাংলা মায়ের এক কৃতি সন্তান (son of the soil) প্রয়াত জোনাস ডি'রোজারিও!

**ডা: এফ রোজারিও**

তিনি ছিলেন অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অনেক উঁচু মাপের এক মানুষ। আচার আচরণে তাঁর ছিল অসাধারন এক ব্যক্তিত্ব। কাজে কর্মে কথাবার্তায় তাঁর ব্যবহার ছিল দারুন ভদ্রোচিত। কাছে থেকে মনে হতো সত্যিই এক মাটির মানুষ। তাঁর আলাপচারিতার স্টাইল ছিল শ্রবণ করার মত দেখার মত। আস্তে আস্তে নীচু কণ্ঠে স্পষ্ট করে সুন্দর ভাষায় কথা বলার ব্যতিক্রম ধর্মী এক স্টাইল। পরিচিত জন বা কাছের মানুষজনের নাম উচ্চারণ করতেন টেনে টেনে সুন্দর করে আদরের সুরে। আজকাল কোনো উঁচু স্তরের মানষের বা কোন নেতৃত্বে তা দেখা পাওয়া ভার।

মিঃ জোনাস ডি' রোজারিওকে আমার প্রজন্মের অনেকেই কাছে থেকে দেখেছেন এবং তাঁকে চিনে থাকবেন কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম তাঁকে চিনে না জানে না। না জানারই কথা। মনে করি আগামী দিনের ভবিষ্যৎ বর্তমান যুবগোষ্ঠি তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত থেকে চমৎকার শিক্ষণীয় গুণাবলী ও অনুকরণীয় কিছু দিক নির্দেশনা নিশ্চয়ই পাবে।

সারা বাংলায় এবং সমগ্র খ্রিস্টান সমাজের এক কৃতি সন্তান গোল্লা মিশনের ছোটগোল্লা গ্রামে পিতা মি: সামুয়েল মধু রোজারিও (চৌড়া) ও মাতা মিসেস রোমানা রোজারিওর (চৌড়া) কোল আলোকিত করে তিনি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ জানুয়ারি দাদুদিদিমার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। দাদুর বাড়ী ছিল হাসনাবাদ মিশনে পেস্কার বাড়ী।

ঐ সময়ে সামাজিক প্রথা অনুসারে মেয়ের ঘরের প্রথম নাতি-নাতকুড় দাদু দিদিমার বাড়ীতে ভুমিষ্ট হয়ে দিদিমার আদর যত্ন সেবা-সুশ্রষার এক রীতি ছিল। দুই ভাই এবং একমাত্র বোনের মধ্যে জোনাস ডি রোজারিও ছিলেন জেষ্ঠ্য। বাল্যকালেই বাবা-মা দুজনেরই অকাল মৃত্যুতে ভাইবোনেরা অনাথ হয়ে পরে। যোনাস ডি রোজারিওর দাদু এবং মামারা ছিলেন তৎকালীন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। কোলকাতায় নিজস্ব তিনতলা বাড়ীসহ তাদের ছিল আর্থিক প্রতিপত্তি।

হৃদয়বান মামা আলেক্স পেস্কার আদরের ছোট বোন ও ভগ্নি জামাইর অকাল মৃত্যুতে স্নেহের তিন ভাগ্নে-ভাগ্নিকে গ্রাম থেকে কোলকাতায় নিজস্ব বাসভবনে রেখে আদর যত্নে লালন পালন করতে থাকেন। তিনি শিশু জোনাসের মাঝে ভবিষ্যত জীবনের এক আলোর ছটা দেখতে পান। ছোট্ট জোনাসকে তিনি কোলকাতায় সেন্ট এন্টনী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেন।

বাল্যকাল থেকেই জোনাস ডি রোজারিও ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কোলকাতা সেন্ট এন্টনী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সমাপ্ত করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ অনার্সে ভর্তি হতে সক্ষম হন। সেখানেও বালক জোনাস ছিল ধারুন এক মেধাবী ছাত্র। জোনাস ইংলিশ অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্বর্ন পদক লাভ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে তিনিই প্রমথ বাঙালি খ্রিস্টান ছাত্র যিনি ইংলিশ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এবং গোল্ড মেডেলিষ্ট। বাবা মায়ের কাছে শুনেছি যুবক জোনাস রোজারিওর এই সুখবর ছিল ঐসময় কোলকাতায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং খ্রিস্টান কম্যুনিটির টক অব দি টাউন। আজ পর্যন্ত কোন বাঙালি খ্রিস্টান ছাত্র ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে কি না সন্দেহ।

কৃতিত্বের সাথে অনার্স শেষ করে মি: জোনাস রোজারিও বৃটিশ সরকারের অধীনে কোলকাতায় উচ্চপদস্হ চাকুরী জীবন শুরু করেন। বৃটিশ সরকার তাঁর চমৎকার রেজাল্টের ভিত্তিতে যথাযথ মর্যাদায় গুরুত্বপূর্ণ এক পোষ্ট ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা CID তে তাঁকে নিয়োগ দেয়। সেখানে দক্ষতার সাথে কাজের সুবাদে তিনি বৃটিশ সরকারের গভর্নর জেনারেল মি: মাউন্টবেটেন্ট সাহেবের সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ পান। বৃটিশ ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই মাউন্টবেটেন্ট সাহেবই ছিলেন গভর্নর জেনারেল।

পাকিস্তান হওয়ার পরও একজন বৃটিশ সাহেব মি: ফেডেরিক ব্রাউন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর হয়ে বেশ কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান করেন। মি: জোনাস রোজারিও জন্মভূমি এবং বাপ-দাদার ভিটেমাটির টানে ভারত থেকে সেচ্ছায় অবসর নিয়ে পূর্ব বাংলায় বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরলে গভর্নর মি: ব্রাউন মি: জোনাস ডি রোজারিওকেই কনফিডেনশিয়াল সেক্রেটারী রূপে নিয়োগ দেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে ব্যাচেলার ডিগ্রিও লাভ করেন। এখানেও টেলেন্টেড জোনাস ডি' রোজারিও সমগ্র বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সর্ব প্রথম আইন শাস্ত্রের ডিগ্রিধারী একজন। ভারত পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলমানদের রায়ট বা কাটাকাটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী কট্টর মৌলবাদী এবং ভারতে কট্টর হিন্দুদের হাত তখনও ছিল রক্তে রঞ্জিত। সংঘাতপূর্ণ ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতের রক্ত তখনও শুকায় নি। তাদের মনমানসিকতাও ছিল চরম কট্টরপন্থী। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের রক্তচক্ষুর আড়ালে পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ পদে কোন এক খ্রিস্টান অফিসার সে কিনা আবার বাঙালি! এত উচ্চ পদে চাকরি করবে? অসম্ভব। তাদের কাছে যোগ্যতা বড় কথা নয়! ধর্মীয় কট্টর মনোভাবটাই বড়। এই নিয়ে তৎকালীন মৌলবাদী দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলি বিশেষ করে আযাদ পত্রিকা নানান কটূক্তি করতে থাকে। অবশেষে মি: জোনাস ডি' রোজারিও স্বেচ্ছায় হাই কোর্টের চীফ জাস্টিসের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন।

সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে হাই কোর্টের প্রথম চীফ জাষ্টিস ছিলেন জাষ্টিস ড. এলিস। মি: জোনাস ডি রোজারিও বিভিন্ন সময়ে দেশের

চীপ জাস্টিসের কনিফডেন্সিয়াল সেক্রেটারী রূপে দক্ষতার সাথে চাকুরি করেন। পূর্ব বাংলায় তিনিই ছিলেন বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রথম ফার্ষ্ট ক্লাস সরকারি গেজেটেড অফিসার।

সরকারি চাকুরী জীবনে তিনি প্রতি গ্রীষ্মকাল ও বড়দিনের ছুটি কাটাতে প্রায়ই গ্রামের বাড়ীতে আত্মীয় সাধারণ জনগণের সাথে সময় কাটাতেন। তখন গ্রামের বাড়ী থাকতো এক প্রকার আনন্দ উৎসব আর কোলাহলপূর্ণ। ঐসময় আঠারগ্রামের নেতা মাতব্বরগণ এবং আসেপাশের হিন্দু মুসলমান গ্রামগুলি থেকে চেয়ারম্যান মেম্বার আইনী পরামর্শ নিতে মানুষজনের ভীড় লেগেই থাকতো। কিন্তু তাঁকে কখনোই বিরক্ত হতে দেখি নাই। স্বভাবসুলভ নরম ভদ্র আচরণে গভীর মনোযোগের সাথে তাদের কথা শুনে সৎ পরামর্শ দিতেন। প্রয়োজনীয় কাজের মাধ্যমে মানুষজনের উপকার করে তিনি কখনো গুণগান নিজ মুখ থেকে বের করতেন না। যা আজকাল সমাজের নেতারা বুক চাপড়িয়ে প্রচার করে আমি করলাম আমি করলাম বলে। মূলতঃ তিনি ছিলেন নীরব এক সমাজ কর্মী।

পাকিস্তান আমলে পশ্চিমা প্রশাসনে বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণে ঢাকা শহর থেকে নবাবগঞ্জ ও দোহার থানার গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল বড় কষ্টকর। শহর থেকে লঞ্চে পাঁচ ছয় ঘন্টার পথ পারি দিয়ে বালুগন্ডা নামক স্টেশনে নেমে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিন সাড়ে তিন মাইল বিস্তৃর্ণ শস্যক্ষেতের (চক) ভিতর দিয়ে গ্রামের বাড়ী যেতে হতো। প্রতিবার গ্রামে আসার পূর্বে তিনি বাড়ীর মুরুব্বিদের জানিয়ে আসতেন। তার আগমনে বাড়ীর জেঠীমা, কাকীমা বৌদিদের মধ্যে রান্নাবান্না পিঠাপুলির এক ধুম পরে যেতো। বাড়ীতে তখন আমরা আট দশ বছরের এক বেটিলিয়ন ছেলেপেলে ছিলাম। বাড়ীর ছোট ছোট ভাই বোন (কাজিন), ভাতিজা ভাতিজিদের তিনি দারুন স্নেহ আদর করতেন। দল বেধে সবাই দাদাকে আনতে যেতাম বালুগন্ডা ঘাটে। সঙ্গে জুটতো গ্রামের বেশ কিছু সমবয়সী বন্ধুবান্ধব। সাথে নিতাম গোটা দুই তিন পাটের বস্তা। ঐসময় মানুষজন নিজস্ব বন্দুক দিয়ে পাখী শিকার করতো। দাদারও নিজস্ব বন্দুক ছিল তাঁরও শুটিং এ সখ ও নিশানায় দারুন হাত ছিল। ঐসময়ে গজিরা, বিলপল্লী চকের মাঝখানে বিশাল এক জলাশয় বা বিল ছিল স্থানীয় লোকজন বলতো ধলী। সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে নানান ধরনের পাখীর আনাগোনা ছিল। দাদায় বিস্তৃর্ণ চক পাড়ি দিতে দিতে এবং বিলের মধ্যে বক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পাখী শিকার করতে করতে আসতেন আর আমরা ঝুড়িকুচির দল দৌড়ে পাখীগুলো বস্তায় ভরে হইচই করতে করতে মহা আনন্দে দাদাকে নিয়ে বাড়ী আসতাম। বাড়ীতে আসার সাথে সাথে আত্মীয়স্বজন মুরুব্বীগণ ওগুলো পরিষ্কার করে রান্নাবান্নায় লেগে যেতো। তারপর চলতো সবায় মিলে আনন্দে খানাদানা।

যদিও বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশেই পাখী বধ করা আইনত নিষিদ্ধ। জোনাস রোজারিও বাড়ী আসছেন এই খবর পেয়ে আঠারগ্রামের নানান সমস্যা, ও সামাজিক উন্নয়নে পরামর্শের জন্য মানুষজন তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর চারপাশে এক প্রকার ভীড় লেগেই থাকতো। মনে আছে গোল্লা সেন্ট থে কলা প্রাইমারী স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করণে গোল্লা মিশনের নেতা প্রয়াত আন্দ্রেজ গমেজ ফকির সাথে আরো কতজন পরামর্শের জন্য কত মিটিং ছিটিং করেছেন। গোল্লা গার্লস হাই স্কুল স্থাপনে যোনাস রোজারিওর অবদান অনস্বীকার্য।

শহরে চাকুরি জীবনে তিনি প্রায় সর্বদা এ্যাশ রং এর টাই স্যুটে কেতাদূরস্ত হয়ে চলতেন কিন্তু গ্রামে এসে তিনি সাদামাটা পোষাকে লুঙ্গি আর দুই পাশে পকেটওয়ালা শার্ট পরে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যেতেন। তখন বাড়ীর নিকটেই ছোট্ট এক মাঠে ভোর বেলায় বাজার মিলতো। এখনকার বৌ-বাজারটা ছোটগোল্লা গ্রামে বাড়ীর সন্নিকট নদী পাড়ের মাঠে মিলতো। জোনাস দাদা সকাল বেলায়ই আমাদের ঝুড়িকুচির দল নিয়ে বাজার করতে বের হয়ে পরতেন। বাজার হয়ে গেলে আমাদের নিয়ে চলে যেতেন মাঠের কোনে খোলা-মেলা আকাশের নীচে এক গোয়ালার দোকানে। সেখানে তিনি আমাদের সবার জন্য ঘোল অর্ডার করে বলতেন তোরা মাঝে মাঝে ঘোল খাবি হজমের জন্য ঘোল খুব উপকারী। বহু বছর পর ডাক্তারী পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম সত্যিতো ঘোল বা ইওগোর্টতো প্রোবাইওটিক হজমের জন্য উপকারী।

খ্রিস্টানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার অবদান দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত খ্রিস্টীয় সমাজ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চ বিশপ গ্রেনার এবং শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস হাউজারের চিন্তা ভাবনায় সুদখোড় কাবুলিয়ালাদের হাত থেকে গরীব খ্রিস্টান জনসাধারণকে রক্ষার্থে ঢাকা খ্রিস্টানদের ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন কর্মঠ এক স্বপ্নদ্রষ্টা। ক্রেডিটের জন্মলগ্নে তিনিই ছিলেন বোর্ড অব ডিরেক্টরদের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল এবং তখন প্রসিডেন্ট ছিলেন এংলো ইন্ডিয়ান কম্যুনিটির নেতা মিঃ সি গুড। যিনি পরবর্তীকালে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী হন। ক্রেডিটের আতুর ঘর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। লক্ষীবাজারে তার নিজ বাসভবনের বৈঠকখানায় দেখেছি স্থানীয় খ্রিস্টান লোকজন নিয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। নিজ হাতে ইউনিয়নের আইনকানুন বা ল (Law) লিখে সরকার কর্তৃক অনুমোদন করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন তৃতীয় বারের মত প্রেসিডেন্ট।

মৃত্যুর পূর্বে হাসপাতালের শয্যা পাশে ক্রেডিটের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এর স্টেটমেন্টে তিনি বলেছেন ঢাকা খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন তাঁর নিজ সন্তানতুল্য এক প্রতিষ্ঠান। সত্যিতো যার (Dreams come true) অন্যতম স্বপ্ন দ্রষ্টা থেকে সত্যিকার প্রতিষ্ঠানের যিনি রূপকার তিনি এই কথাতো বলতেই পারেন। আবারও বলতে হয় খ্রিস্টীয় সমাজের তিনি ছিলেন নীবর এক কর্মী কখনো নিজের নাম জাহির করতেন না।

ঢাকা খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান সমসাময়িক নেতা মিঃ বাবু মার্কুস গমেজের নাম এখানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। মিঃ গমেজের সময়ের বোর্ড অব ডিরেক্টর মিটিং এ সর্বসম্মতি ক্রমে হাসনাবাদে মিশনে নির্মীত ক্রেডিটের সুরম্য ভবনটি স্বপ্নদ্রষ্টা ও খ্রিস্টান কম্যুনিটির উচ্চ পর্যায়ের নীরব কর্মী ক্রেডিটের জন্মলগ্নে সেক্রেটারী এবং তিনবারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রয়াত মিঃ জোনাস ডি' রোজারিওর নামে উৎসর্গ করেছেন। ভবনটি যুগযুগ ধরে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে মিঃ জোনাস ডিঃ রোজারিওকে স্থানীয় জনগণের কাছে স্মরণীয় করে রাখবে।

মিঃ জোনাস ছিলেন ধর্ম ভীরু এক ব্যক্তিত্ব।

লক্ষ্মীবাজার মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বা সামাজিক কাজে শ্রদ্ধেয় ফাদার হ্যারিংটন সিএসসি ও শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস ইয়াং সিএসসির সাথে মিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি প্রচুর সহায়তায় করেছেন। কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজার সাথেও মি: যোনাস ডি'রোজারিওর ছিল আত্মার সম্পর্ক। মাদার তেরেজা জরুরী প্রয়োজনে পত্র মারফৎ মি: যোনাস ডি' রোজারির সাথে পরামর্শ করতেন।

সাধ্বী মাদার তেরেজার হাতের লিখা অনেক পত্রের মধ্য থেকে একটি পত্র এখানে তুলে ধরা হলো। কোলকাতায় মাদার তেরেজা **যখন** আটজন বাঙালি মেয়েদের নিয়ে তাঁর পালকীয় যাত্রা শুরু করেন সেই আটজনের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন মি: জোনাস ডি' রোজারিওর জেষ্ঠ সন্তান প্রয়াত সি: বিয়াট্রিস রোজারিও। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ও আরএনডিএম সি: তেরেজা রোজারিও। বর্তমানে তিনি ঢাকা গ্রীন হ্যারাল্ড হাউজে আছেন।

পাকিস্তান আমলে এংলোইন্ডিয়ান-বাঙালি খ্রিস্টানদের সমন্বয়ে গঠিত কাথলিক এসোসিয়েশন অব ঢাকা (CAD) এর তিনি ছিলেন একসময়ের সভাপতি এবং বাঙালি খ্রিস্টান ও এংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে দোভাষী সেতু বন্ধন স্বরূপ এবং দীর্ঘদিনের পরামর্শদাতা। পাকিস্তান আমলে ঢাকা লক্ষীবাজার থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত ইংলিশ বুলেটিন দি লিংক (THE LINK) এর তিনি ছিলেন কন্ট্রিবউটার এবং পরামর্শ দাতা। আঠারগ্রামের মিশনগুলোর উন্নয়ন মূলক কাজে এবং বিভিন্ন সমস্যায়ও তিনি ছিলেন পরামর্শ দাতা।

উপযুক্ত এবং কর্মাদক্ষ মি: জোনাস ডি: রোজারিও সুনামের সাথেই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাই কোর্টের চীফ জাস্টিসের সেকেটারী পোষ্টে থেকে সরকারী নিয়মানুযায়ী অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরপরই ঢাকার বৃটিশ হাই কমিশন মি: জোনাস ডি: রোজারিও কে উচ্চ পদস্ত এক পোষ্ট ফিনেন্স অফিসার হিসাবে নিয়োগ দেয়। বৃটিশ হাই কমিশন অফিসটি ছিল তখন ডিআইটি বিল্ডিং এ। বিকেলে অফিস শেষ করে তিনি রাস্তা পাড় হয়ে স্টেডিয়ামের ফুটপাতে আসার প্রাক্কালে পিছন থেকে এক জীপ গাড়ীর প্রচণ্ড আঘাতে তিনি মারাত্মক এক্সিডেন্টের কবলে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি তখন মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। দাদার দুর্ঘটনার সংবাদে দৌড়ে হাসপাতালে তার শয্যা পাশে যাই। দুর্ঘটনায় মি: জোনাস ডি: রোজারিওর উরুর হাড়ের উপরি অংশ ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ডিএমসির অর্থপিডিক ডিপার্টমেন্ট প্রধান প্রফেসর ডা: ওমর জামাল মেডিকেল হাসপাতাল থেকে তাঁকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে স্থানানান্তর করেন। সেখানে অপারেশনের কয়েক দিন পর তাঁর রক্তে জমাট (CLOT) বাঁধলে ঐ সময়ে ঢাকার চিকিৎসায় তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তিনি পরিবারের সকলকে এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব, লক্ষ্মীবাজার, গোল্লা, হাসনাবাদ মিশনের অনেককে কাঁদিয়ে পরমেশ্বরের ডাকে সারা দিয়ে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ জুন এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। আমরা প্রার্থনা করি পরমকরুনাময় ঈশ্বর তার যোগ্য সেবক মি: জোনাস ডি: রোজারিওকে যেন চির শান্তি প্রদান করেন। আমেন।

## স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল স্মরণীয় বরণীয় তুমি

**ইলারিয়াস রোজারিও (এলু)**
**জন্ম:** ১৯ মে, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
**মৃত্যু:** ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁওয়ের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, সমাজ ও সমবায়ী সংগঠক এবং প্যারিসের প্রতিষ্ঠাকালীন কাউন্সিলর ইলারিয়াস রোজারিও'র প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধাভরে।

ইলারিয়াস রোজারিও বর্তমান সাতরাস্তা সংলগ্ন সিএসডি খাদ্য গুদাম এলাকায় তৎকালীন ফ্রেঞ্চ গার্ডেন, মিশন ভিত্তিক নাম 'পুব পাড়া'য়- বর্তমান দক্ষিণ বেগুনবাড়িতে ১৯ মে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কেতু ফ্রান্সিস রোজারিও এবং মাতা মাগ্দেলেনা রোজারিও। ম্যাট্রিক পাসের তিন বছর পর তিনি আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে চাকুরিতে যোগ দেন এবং সফল অবসর জীবন যাপন করেছেন।

বিশিষ্ট নাট্য ও অভিনয় শিল্পী ইলারিয়াস রোজারিও তেজগাঁও অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন 'খান' নামে। তেজগাঁওয়ে বহুবার মঞ্চস্থ 'ঈশা খান' নাটকে ঈশা খান চরিত্রে অভিনয় প্রিয়তার কারণে স্থানীয় নাট্য দর্শকদের এবং সুহৃদ মহলে 'খান' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। বিগত শতাব্দীর ষাট, সত্তর এবং আশির দশকে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নাগরী, হাসনাবাদ ও গোল্লার বিভিন্ন মঞ্চে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় ভিত্তিক ৫৪টি নাটকে অভিনয় করেন তিনি।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বোয়ালী গ্রামের জর্জ গমেজ ও জীতা কস্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ফাদার জ্যোতি এ গমেজের বোন বেলা মেরি স্টেল্লার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রার্থনাশীল এই পরিবার সেজ সন্তান প্রমোদ থিওফিল রোজারিওকে ব্রাদার এবং কনিষ্ঠ সন্তান প্রবাস পিউস রোজারিওকে জেজুইট যাজক পদে উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছেন। পরমপিতার বক্ষে খ্রিস্টেতে তার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

### শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

**সহধর্মিনী:** বেলা মেরী স্টেল্লা রোজারিও

**সন্তান:** প্রভাতী গের্ট্রুড রোজারিও, বাদল কোড়াইয়া (জামাই), প্রফুল্ল লিনুস রোজারিও, ভেরোনিকা কস্তা (পুত্রবধু), প্রণয় পলিকার্প রোজারিও, জেইন প্যাট্রিসিয়া গমেজ (পুত্রবধু), ব্রাদার প্রমোদ থিওফিল রোজারিও সিএসসি, প্রমিলা বার্নাডেট রোজারিও, সুমন পিরিজ (জামাই), ফাদার প্রবাস পিউস রোজারিও এস জে, প্রতিভা ভেরোনিকা রোজারিও, সনি রোজারিও (জামাই)

**নাতি-নাতনি:** কুঞ্জন কোড়াইয়া, মৌসুমী (নাত বৌ), পৃথা অতন্দ্রিলা, সুমন (নাতিন জামাই), প্রৈতি, সান্দ্র প্রাতঃ, অম্মিতা, শ্রেয়া, স্তুতি, শ্রেষ্ঠ, স্পন্দন

**পুতি:** প্রাচুর্য ও প্রাচ্য

স্মৃতিকথা

# সিস্টার পলিন নাডো সিএসসি: বাংলাদেশে ম্যারেজ এনকাউন্টার আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ



পলিন ফ্রান্সিস

কৃষক যেমন ভাল ফসল পাওয়ার জন্য প্রথমেই প্রস্তুত করে ভাল বীজতলা, সেখান থেকে খুব ভাল চারা নিয়ে উপযুক্ত জমিতে তা রোপন করে উত্তম ফসল ঘরে তোলে, ঠিক তেমনি কানাডিয়ান সিএসসি সম্প্রদায়ের সিস্টার পলিন নাডো ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে দশ জোড়া দম্পতি নিয়ে রমনা ক্যাথিড্রালে দাম্পত্য জীবনের উপর একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। পনেরো দিন অন্তর অন্তর প্রশিক্ষণ চলে প্রায় তিন মাস। উদ্দেশ্য যাতে করে আমরা প্রথমতঃ নিজেকে জানতে পারি, অতঃপর পরস্পর পরস্পরকে জেনে বুঝে ম্যারেজ এনকাউন্টারে অংশ গ্রহণ করে লাভবান হই। দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি অধিবেশন পরিচালনা করেন। ঐ অধিবেশনগুলিতে প্রথমে যে বিষয়টি তিনি শিখিয়েছেন তা হলো নিজেকে জানা। যদি নিজেকে না-ই জানি, তাহলে আমার যে জীবন সঙ্গী তাকে জানব কি করে। তাই শ্রদ্ধেয় সিস্টার সেই বিষয়টি নিয়েই যাত্রা শুরু করেন ।

নিজেকে জানার জন্য আমাদের দিয়ে যে অনুশীলনটি করিয়েছিলেন সেটা হল নিজের তথা পরস্পরের গুণ দোষ সম্বন্ধে লেখা। বড্ড বিপাকে পড়েছিলাম। দোষের কথা সহজে বলা যায় বটে, কিন্তু গুণের কথা ..। শেষ অবধি সিস্টার আমাদের দিয়ে কাজটি করিয়েছিলেন। আমরা নিজেকে যেমন আবিষ্কার করেছি, তেমনি আবিষ্কার করেছি আমাদের জীবন সঙ্গী/ সঙ্গিনীকেও। আর যখন এভাবে নিজেদের জানতে পেরেছি, বিস্ময়াভিত হয়েছি এই ভেবে যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের শূণ্য হাতে পাঠাননি। অনেক তালান্ত দিয়েছেন, শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে।

শ্রদ্ধেয়া সিস্টার আমাদের আরও শিখিয়েছেন আমাদের ভালবাসা কিভাবে গভীর হবে। ভালবাসার প্রকাশ, কোন কিছু গোপন না করা, ক্ষমা দেয়া/ক্ষমা নেয়া, পরস্পরের পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে জানা, উভয়কে মূল্য দেওয়া, প্রশংসা করা, উভয়ের পরিবারের বাবা-মা, আত্মীয় পরিজনের প্রতি ভালবাসা, সম্মান, সৌজন্য প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেন।

এই প্রস্তুতিপর্ব শেষে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, আর্থিক তথা সার্বিক সহযোগিতায় আমরা সাত জোড়া দম্পতি, দু'জন পুরোহিত প্রয়াত ফাদার ফ্রান্সিস পালমা এবং প্রয়াত ফাদার অতুল পালমা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ ৫-৭ মে এই তিন দিন বোম্বের পায়াস সেমিনারীতে অনুষ্ঠিত ম্যারেজ এনকাউন্টার উইকএন্ডে অংশ গ্রহণ করি। এই উইক এণ্ড না করলে কোন দিনও বুঝতে পারতাম না কি করে দাম্পত্য সম্পর্ক এত সুন্দর, শক্তিশালী, ও অটুট রাখা যায়। নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির উপর পরিচালক মণ্ডলী সপ্তাহান্ত পরিচালনা করেন-

১) বিবাহিত জীবনে আমাদের অনুভূতি।
২) আত্মবিশ্লেষণ।
৩) আমাদের মুখোশ।
৪) আলাপ।
৫) পরস্পরের মূল্য দেওয়া।
৬) ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বিবাহ।
৭) সাক্রামেন্তীয় দাম্পত্য জীবন।

উক্ত বিষয়ের উপর পরিচালকবৃন্দ যেভাবে তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেছিলেন তা আমাদেরকেও প্রভাবিত করেছিল।

আমাদের মনে হয়েছে একই ঘটনা তো আমাদের জীবনেও ঘটছে অহরহ। চাপা কষ্টগুলি পরস্পরের কাছে মুখ ফুটে বলতে পারিনি ফলে আমাদের সম্পর্কে দূরত্ব বেড়ে গেছে মনের অজান্তেই। এমনই করার পর আমরা বুঝতে পেরেছি কতবার আমরা পরস্পরকে মূল্য দেই নি, সময় দেইনি, ক্ষমা করিনি, আমাদের ভুল স্বীকার করিনি, ভাল লাগা না লাগা, পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলি খোলাখুলি আলাপ করিনি, যার ফলে দূরত বেড়েছে, কষ্ট বেড়েছে, পরস্পরের কাছে কেমন অচেনা হয়ে উঠেছি।

সিস্টার পলিনের স্বপ্ন ছিল একদিন বাংলাদেশের প্রত্যেক দম্পতি পরস্পর পরস্পরকে সময় দিবে, কাছাকাছি, পাশাপাশি, মুখোমুখি বসে, চোখে চোখ রেখে বলবে, "I love you. I will never find another you." সেই সাথে মনে করবে তাদের প্রথম দিনের ভালবাসার কথা। আমি মনে করি তাঁর এই স্বপ্ন সফল হয়েছে। যারা ম্যারেজ এনকাউন্টার করেছেন তাঁরা এক বাক্যে তা স্বীকার করবেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ম্যারেজ এনকাউন্টার আন্দোলন "কাথলিক বিশপস্ কনফারেন্স অব বাংলাদেশ"এর স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ফ্যামেলি ওয়েলফেয়ার কমিশনও পারিবারিক প্রতিকূল অবস্থার দায়ভার নিয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি জেনেছেন তাঁর কঠোর শ্রমের ফসল ম্যারেজ এনকাউন্টার মুভম্যান্ট বাংলাদেশে চলমান রয়েছে। এটাই তাঁর জীবনের পরম পাওয়া।

সিস্টার হওয়ার পর শিক্ষকতা শুরু করলেও তিনি পিপাসিত ছিলেন মিশনারী হওয়ার জন্য। আর দেশ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আমাদের এই বাংলাদেশকে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ নভেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশে (তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে) আসেন এবং ভাষা শেখার পর বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও দিয়াং এ তাঁর পালকীয় কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ছুটির অবসরে নিজ দেশে ওটোয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবার কেন্দ্রিক যাবতীয় প্রশিক্ষণ লাভের পর আবার ফিরে আসেন এই বাংলায়। মানব সম্পর্ক উন্নয়নে মহিলা ও দম্পতিদের নিয়ে শুরু করেন তাঁর পালকীয় কাজ গ্রামাঞ্চলে। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ থিয়োটোনিয়াস গমেজের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ঢাকায় থিতু হন। দম্পতিদের সঙ্কটকালে নানা পরামর্শ ও সেবা দানের জন্য মণিপুরী পাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন পারিবারিক সেবা কেন্দ্র (পাসেকে)। শ্রদ্ধেয় ফাদার এ্যাঞ্জেলো মারটিন ওএমআই এবং ফাদার জর্জ পোপ সিএসসি ও বিভিন্ন সময় নানাভাবে সিস্টার পলিনকে সাহায্য করেন। এই নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গের সেবায় যে সম্পদ আমরা লাভ করেছি তা অতুলনীয়। নমস্য মানিক নাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ খুব বলতে ইচ্ছে করছে, সিস্টার পলিন, তুমি আমাদের অনেক দিয়েছ, অনেক নিয়েছি, অনেক জমেছে ঋণ শোধিতে কখনও পারিব না, আমরা তাহা কোনদিন। অকাতরে যা দিয়ে গেছ তার পুরস্কার তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। এই নিবেদিত প্রাণ, মহিয়সী সিস্টার পলিন নাডো, গত ৩০ শে আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কানাডার মন্ট্রিয়াল শহরে পরলোক গমন করেন। পিতার চরণে আমাদের আকুল প্রার্থনা, দেবোলোকে তিনি যেন রাখেন তোমায় সদানন্দে।

**তথ্য সূত্র:**

WWME 37th AsSHIAN CONFERENCE-2012, BANGLADESH

# মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা

**চয়ন হিউবার্ট রিবেরু**

সমসাময়িক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত, সমালোচিত, ভয়ের ও উৎকণ্ঠার কারণ হল কোভিড-১৯। বিশ্বে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর ১৯,২০২১ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত দেশ ও অঞ্চল ২২২ টি, মোট ২৫,৫৯,২৬,১৫৮ জন আক্রান্ত, মোট সুস্থ ২৩,১৩,০৬,৩৬১ জন, মোট মৃত্যু ৫১,৪২,৯৭১ জন। বাংলাদেশে মোট ১৫,৭৩,৭১১ আক্রান্ত, মোট সুস্থ ১৫,৩৭,৮১৬ জন এবং মোট মৃত্যু ২৭,৯৪৬ জন (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)।

মানুষের লোভ, লালসা ও উন্নয়নের নেশায় বর্তমান পৃথিবীতে নানা অস্থিরতা ও জটিলতার মধ্যদিয়ে দিনাতিপাত করছে। এর ফলে, মানুষের মধ্যে নানা ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। শিশু থেকে বয়োজেষ্ঠ্য সকল মানুষের স্বাস্থ্য, আচার আচরণে প্রভাব ফেলছে। আবার মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও এর প্রভাব বিস্তার করছে। ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করলে বলা যায় যে মানুষের সৃজনশীলতা / কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কমছে। মানসিক চাপ তখনই হয় যখন একজন মানুষ তার বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়। যদি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি কোন্ কোন্ বিষয়গুলো আমাদের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে? উত্তরে বলা যায়: ছেলেমেয়েদের স্কুল সংক্রান্ত, পরিবার, বিভিন্ন আত্মিক ও সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়ন, আইনগত, আর্থিক, অসুস্থতা, পরিবেশ এবং জীবন যাপন ইত্যাদি।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে মানুষ অবরুদ্ধ, জীবন জীবিকার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে মানুষের মনের উপর চাপ তৈরী হয়েছে। যার ফলে কেউ মেজাজ হারিয়ে ফেলছে, কেউ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, কেউ বিষন্নতা-হতাশায় ভুগছে, কারো আবার অকারণে পরিবর্তন আসছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে এটা এক ধরনের প্রাকৃতিক বিষয়ও বটে। প্রতিটি যুগে যুগে এ ধরনের বিবর্তন ঘটেছে বা হয়েছে। একটা সময় ডাইনোসর খুব প্রতাপের সাথেই ছিল, কিন্তু প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে আজ তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। আবার জুরাসিক যুগের তেলাপোকা আজও বহাল তবিয়তে আছে। কারণ তারা নিজেকে বিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে পরিবর্তন করেছে এবং প্রকৃতিতে টিকে আছে। উদাহরণ দু'টো কেন টানলাম বা এগুলো জেনেই বা কি হবে?

আমাদেরও প্রকৃতির সাথে বা প্রকৃতির উপাদানের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে এবং বিবর্তিত হতে হবে। লড়াই করেই টিকে থাকতে হবে। আমাদের নিজেদের পরিবর্তিত হতে হবে এবং কিছু নিয়ম মেনে চললেই আমাদের টিকে থাকা সম্ভব এবং তা মেনে চলতে পারলেই পরিবর্তীত পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের কাছে সহজতর হবে।

এ বিষয়গুলোর সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়া, ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের মানসিক চাপমুক্ত করতে পারি এবং আশে পাশের সবাইকে নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারি।

**কোভিড-১৯ ভাইরাস কী?**

করোনাভাইরাস একটি সংক্রামক জীবাণু। 'কোভিড-১৯' করোনাভাইরাসের সংক্ষিপ্ত নাম। এর শব্দগত অর্থ হলো: (CO) 'কো' মানে 'করোনা',(V) 'ভি' মানে 'ভাইরাস' এবং (D) 'ড' মানে 'ডিজিজ'। করোনা (CoV) হচ্ছে ভাইরাসের একটি বৃহৎ পরিবার যা সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে শুরু করে মারাত্মক অসুখ সৃষ্টি করতে পারে, যেমন Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV), কোভিড-১৯ (COVID-19) ইত্যাদি। এ ধরনের ভাইরাস সাধারণত নাক, সাইনাস বা উপরের গলায় সংক্রমণ ঘটায়। করোনাভাইরাসের অনেকগুলো প্রজাতির মাঝে ৭টি প্রজাতি মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করে, যার মাঝে SARS-CoV-2 অন্যতম। COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) নামক রোগ সৃষ্টিকারী Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 বা SARS-CoV-2 (NOVEL) করোনা ভাইরাস একটি নতুন প্রজাতি, যা ইতোপূর্বে মানব শরীরে দেখা যায়নি। বিজ্ঞানীরা করোনাভাইরাসগুলিকে জুনোটিক ভাইরাস বলেন, যার অর্থ এ ধরনের ভাইরাস পশু-পাখি থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ করতে পারে। এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষের মধ্যেও ছড়ায়।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দে এই ভাইরাসের সূত্রপাত হয়, একারণে 'কোভিড'-এর সাথে '১৯' সংখ্যাটি যুক্ত করা হয়েছে। একসাথে সংক্ষেপে বলা হয় 'কোভিড-১৯'। এই ভাইরাস ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর প্রথম চীনের উহান শহরে সংক্রমিত হয় এবং পরবর্তীতে চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি 'কোভিড-১৯'- কে বিশ্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করে।

এ ভাইরাসের প্রতিকারের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি, তাই এর প্রতিরোধ করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী অনুসরণ করা অতীব জরুরী ও আবশ্যক। করোনার ব্যাপক বিস্তার রোধে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চললে এই ভাইরাসের ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে মানুষ বাঁচতে পারবে ।

**মানসিক চাপ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকজন বিশেষজ্ঞদের মতামত আলোকপাত করা হল:**

মনোচিকিৎসকের মতে, মানুষ যখন তার মানসিক চাপ আর সহ্য করতে পারে না, তখনই সে মানসিক ও শারীরিক রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং তার আচার আচরণে প্রকাশ পায়। শারীরিক বা মানসিক, অভ্যন্তরীণ বা বহিস্থ, উচ্ছ্বাসমূলক বা উত্তেজক পদার্থের প্রতি শারীরিক সাড়ার সামগ্রিকতাকে স্ট্রেস বলে। আর যে ঘটনার জন্য এ স্ট্রেস তৈরী হয় তাকে Stressor বলে।

যে কোন অবস্থা/চিন্তা থেকে কর্মী উদ্বিগ্নতা, ক্রোধ, নিরাশা ও বিষন্নতা অনুভব করলে তাকে মানসিক চাপ/কর্মী পীড়ন বলে। তাই মানসিক চাপ হচ্ছে শারীরিক, মানসিক/ আবেগের সমন্বয়ে পরিবর্তিত এক দৈহিক প্রতিক্রিয়া।

বিখ্যাত কয়েকজন মানসিক চাপ বিষয়ক বিশারদের সংজ্ঞা থেকে তা সহজে অনুমান করা

যাবে আসলে মানসিক চাপ বলতে উনারা কি বুঝাতে চেয়েছেন:

**Hans Selye** (one of the founding father of stress research): "Stress is not necessarily something bad – it is all depends on how you take it. The stress of exhilarating, creative successful work is beneficial, while that of failure, humiliation or infection is detrimental".

**Richard and Lazarus:** Stress is a condition or feeling experienced when a person perceives that demand exceed the personal and social resources the individual is able to mobilize".

**Decenzo and Robins:"** stress is a dynamic condition in which an individual confronts an opportunity, constraint, or demand related to what he or she desires, and for which the outcome is perceived as both uncertain and important."

উপরোক্ত বিশারদদের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরিবর্তীত পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের মধ্যে যে রাগ, নিরাশা ও দুঃখ বা হতাশা দেখা যায় তাকেই মানসিক চাপ বলে।

**স্ট্রেস কিভাবে তৈরী হয়:** স্নায়ূতন্ত্র এবং কিছু নির্দিষ্ট হরমোনের মাধ্যমে আমাদের শরীর স্ট্রেসরের প্রতি সাড়া দেয়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি গ্রন্থির মাধ্যমে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিকে বেশী পরিমাণে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসোল হরমোন তৈরী করার জন্য এবং তা রক্তে অবমুক্ত করার জন্য সংকেত পাঠায়। এ হরমোন হার্টের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে স্ট্রেস তৈরী করে।

**তাছাড়া সামগ্রিকভাবে সম্ভাব্য প্রধান তিন ধরনের মানসিক চাপের উৎস ও তার ফলাফলের চিত্র নিম্নে দেখানো হল:**

**কোভিড ১৯ এর ফলে মানুষের কিছু সাধারণ মানসিক চাপের বিষয় পরিলক্ষিত হয়**

- অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ হওয়া
- চিন্তা, ভয় ও উদ্বিগ্নতা
- অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা
- দুঃখ দুঃখ ভাব, কান্না পাওয়া, সাধারণ কাজে আনন্দ হারিয়ে ফেলা
- হার্ট বিট বেড়ে যাওয়া, পেট খারাপ হওয়া, অবসাদগ্রস্থতা, অন্যান্য অসস্তিতে ভোগা
- হতাশা, নিরাশা
- ঘুম কম হওয়া ও না ঘুমানোর ফলে রাগান্বিত হওয়া
- নিজেকে অসহায় মনে করা
- কোন কাজে মনোযোগ দিতে না পারা
- নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা বা বিছিন্নভাবা
- নিজেকে মানুষের কাছ থেকে বিছিন্ন রাখা
- সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করার ইচ্ছা

**মানসিক চাপের লক্ষণ**

সাধারণ তিন ধরনের মানসিক চাপের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়:

১) **শারীরিক:** মানসিক চাপের জন্য একজন মানুষের ভিতরে ও বাহিরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যার প্রভাব মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় এবং যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলো হল: শারিরীক শ্রান্তি, পেশিতে খিচুনি, হার্টবিট বৃদ্ধি, মাথাব্যথা, অনিদ্রা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

২) **মনস্তাত্বিক:** একটি প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যে, মন ঠিক তো সব ঠিক। আর মানসিক চাপটি প্রথমেই আঘাত হানে মানুষের মনে আর যদি মন ভেঙ্গে যায়, তাহলে মানুষ কাজ থেকে তার মনকে সরিয়ে নেয়। এর ফলে যে প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো হল: উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি, কাজের প্রতি উদ্যমহীনতা, হঠাৎ করে উত্তেজিত হওয়ার প্রবণতা, হাতাশা প্রকাশ করা, অসহিষ্ণুতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি।

৩) **আচরণগত:**মানসিক চাপের কারণে একজন মানুষের আচার আচরণের উপর প্রভাব পড়ে এবং তার ফলে কাজের গতিশীলতা বা উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এছাড়া যে প্রভাবগুলি দেখা যায় সেগুলো হ'ল: কাজে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকা এবং তা দিনদিন বৃদ্ধি পায়, আক্রমানাত্মক মনোভাব,সৃষ্টিশীলতা হ্রাস, আন্তঃসম্পর্ক'র অবনতি ঘটে, খাদ্যাভাসে পরিবর্তন, অস্থিরতা এবং ধুমপান বা মাদক গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া।

**মানসিক চাপ/পীড়ন কমানোর উপায়**

মানসিক চাপের কারণে মানুষের কর্ম ক্ষমতা, স্বাস্থ্যের অবনতি ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব ফেলে, তখন মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয়া অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। তাই মানসিক চাপের মাত্রা এবং এ চাপ কমানোর কিছু উপায় আলোচনা করা হল:

১) **মানসিক চাপের লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা:** পরিবেশের কারণে বা বর্তমানে করোনার কারণে মানুষ মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পরেছে এবং বিভিন্ন লক্ষণ তখন পরিলক্ষিত হয়। এ লক্ষণগুলো কী তা প্রথমে চিহ্নিত করা অতি জরুরী এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২) **নিজের প্রতি যত্নবান হওয়া:** এর অর্থ এ নয় যে আমার পুরো জীবনটাই পাল্টিয়ে ফেলা। ছোট ছোট অভ্যাস পরিবর্তন করে, বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে, আমরা আমাদের মানসিক চাপ কমিয়ে কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারি। যেমন: প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় বের করে ব্যায়াম করা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে এবং সামাজিক কোন স্বেচ্ছা সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে কাজ করে একজন মানুষ মানসিক চাপ কমাতে পারে এবং কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে।

৩) **সময় ব্যবস্থাপনা:** সময় এমন একটি সম্পদ যা সবাইকে সমানভাবে দেয়া হয়েছে, কাউকে কম বা বেশী দেয়া হয়নি। দিনে সবার জন্যই ২৪ ঘন্টা আবার ইচ্ছা করলে এ সময় ধরে বা জমিয়ে রাখা যায় না। তাই এর সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের মানসিক চাপ কমাতে পারি এবং নিজেদের অবসর সময়কে উপভোগ করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন একটি কর্মতালিকা প্রস্তুত করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা। পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজের চাপ না নেয়া, সময় মত অফিসে আসা এবং সময় মত অফিস ত্যাগ করা ইত্যাদি। এ মহামারির সময়ও আমরা পরিবারের সকলকে নিয়ে ও সকলের মতামত নিয়ে একটি করোনাকালীন সময় ব্যবস্থাপনার তালিকা প্রস্তুত করতে পারি এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারি।

৪) **অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ:**একজন মানুষ তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যদি তার অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তা হলে, সে যে কোন গঠনমূলক

বা ইতিবাচক কাজে নিজেকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন আত্মসচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সচেতনতা এবং সম্পর্ক উন্নয়ন করার চেষ্টা করা।

৫) **বদ অভ্যাস ত্যাগ :** কিছু লোক আছে তারা মনে করে সব কিছু সঠিক হতে হবে বা পারফেকসনিষ্ট হতে হবে। সব কিছু নিখুঁত হতে হবে এমন অবাস্তব চিন্তা না করাই ভাল। তাই একেবারে বিশুদ্ধবাদী না হয়ে, সময়মত কাজ সম্পাদন, বদ অভ্যাস এবং নেতিবাচক চিন্তাগুলো ত্যাগ করতে পারলে মানসিকচাপ অনেক কমে যায়।

৬) **সাংগঠনিক উপায়:** মানসিক চাপ প্রশমনের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক সেচ্ছা সংগঠনের সাথে নিজেকে সংপৃক্ত করা এবং মানব কল্যাণে কাজ করা। আর চাকুরি ক্ষেত্রে বিশেষত এ বৈশ্বিক মহামারির সময়ে ব্যবস্থাপক কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মানসিক চাপ নিরসন করতে পারেন। তাছাড়া, কর্মীদের চাকুরির অনিশ্চিয়তা দূর, চাকুরির উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীদের অংশগ্রহণ, পারিতোষিক ও পুরস্কার প্রদান,দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো যায়।

**করোনাকালীন মানসিক চাপ কমাতে করণীয়**

- মনে রাখবেন, সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ করোনা ভাইরাসের মহামারির কবলে পড়েছে। অনেকে আপনার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে। আপনি একা নন - এ ভাবনা আপনাকে স্বস্তি দেবে;
- টেলিফোনে, ভিডিও কলে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আপনজনদের সাথে কথা বলুন মন হালকা রাখুন;
- জীবন করোনাময় করে ফেলবেন না। সারা দিন করোনার আপডেট দেখা, এ বিষয়ে পড়া ও দেখা, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। জীবনের অন্য বিষয়গুলোকে প্রধান্য দিন;
- সঠিক তথ্য জানতে নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যবহার করবেন। গুজবে কান দেবেন না।গুজব আতঙ্ক ছড়াতে সাহায্য না করা;
- সুষম খাদ্যাভ্যাস, ঘুম আর নিয়মিত ব্যায়াম চালিয়ে যান। রুটিনমাফিক চলুন। রুটিনের ব্যত্যয় হলে দেহে হরমোন ও নানা রাসায়নিকের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এতে মানসিক চাপ বাড়ে;
- পরিবারের সবার সাথে গুনগত সময় কাটান। সন্তানদের সাথে ঘরেই খেলাধুলায় মেতে উঠুন, গল্প করুন কিংবা ছবি আঁকুন, রান্না করুন, সিনেমা দেখুন। প্রিয় অন্য কোন কাজ, যেমন, বাগান করা, বই পড়া ইত্যাদি অব্যাহত রাখুন। এসব কাজ মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে;
- মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা কমাতে ধুমপান বা কোন নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করবেন না। এতে করোনার সংক্রমণের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়; এবং
- ক্রান্তিকালে যারা বিপদে রয়েছেন, তাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিন। কিছু করতে না পারলেও খোঁজখবর নিন, মানসিক সমর্থন জোগান। এতে মানসিক স্বস্তি পাবেন।

**করোনা কালীন পরিবারে সদস্যদের ভাল থাকার উপায়**

যাদের করোনা হয়েছে নিশ্চিত বা যাদের হয়েছে বলে সন্দেহ. তাদের কীভাবে খেয়াল রাখবেন পরিচর্যাকারী বা কেয়ার গিভাররা, সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেয়া হল:

- আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পান, পুষ্টিকর খাবার খান, প্রচুর পানি আর তরল পান করেন;
- একই ঘরে যখন সেবা কাজ, তখন মেডিক্যাল মাস্ক পরবেন দুজনে। হাত দিয়ে মাস্ক ধরবেন না। মুখে হাত দেবেন না। কাজ শেষে ফেলে দেবেন ময়লার ঝুড়িতে;
- বারবার হাত ধোবেন সাবান পানি দিয়ে বা স্যানিটাইজার দিয়ে, অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে বা এর চারপাশের সংস্পর্শে এলে খাবার তৈরির আগে, খাবার খেতে বসার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর;
- অসুস্থ মানুষের জন্য আলাদা বাসনপত্র, তোয়ালে, বিছানার চাদর - এসব জিনিস সাবান দিয়ে ধুতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তি যা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন, সেগুলো বারবার জীবাণু শোধন করুন;
- অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা শোচনীয় হলে বা শ্বাসকষ্ট হলে স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে ফোন করুন।

(সুত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)

**করোনাকালিন শিশু মানসিক চাপ কমানোর করণীয়**

- সহজ ও সংগতিপূর্ণ রুটিন তৈরি করুন
- সন্তান আপনাকে দেখেই শিখে
- সন্তানকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে শেখান
- হাত ধোয়া ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাকে আনন্দদায়ক করে তুলুন
- হাত ধোয়া আনন্দদায়ক করতে ২০ সেকেন্ডের গান তৈরি করতে পারেন
- খেলার ছলে কে কতবার নাক, মূর্খ-চোখ স্পর্শ করেছে, তা নির্ণয় করতে পারেন
- সবচেয়ে কম স্পর্শ করবে যে, তার জন্য থাকবে পুরস্কার।

**উপসংহার:** বৈশ্বিক মহামারির কারণে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। মানসিকচাপ যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তা হলে মানুষ তার ইস্পিত লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধাগ্রস্ত হয় এবং মানুষ তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। এ প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনকেও অসহনীয় করে তোলে।

অতএব কোভিড ১৯ মহামারির জন্য সারা বিশ্বে যে প্রভাব পড়েছে এবং আমাদের যে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে মানিয়ে নেওয়া ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্য মঙ্গলরকর। কোভিড ১৯-এর মহামারির ফলে সৃষ্ট মানসিক চাপ প্রশমন করা একার বিষয় না, প্রয়োজন সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সম্মিলিত প্রয়াস।

**তথ্য সূত্র:**

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা... মো. শাহ্ আলম, মীর সাজ্জাদ আলী, সুশান্ত রায় চৌধুরী, গাজী শাহ্ আল-হেলালী, মোহ: আব্দুস সালাম

Organizational Behavior -Stephen P. Robbins,Timothy A. Judge,Neharika Vohra

Leadership and Management Training materials by Sr. Gloria OLS

ডা: আলমগীর মতি কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ - বাংলাদেশ প্রতিদিন

দৈনিক প্রথম আলো, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আইইডিসিআর ইত্যাদি॥

স্বাস্থ্য কথা

# ছানি বা ক্যাটারাক্ট অপারেশন

ডা: মার্ক টুটুল গমেজ

চোখ মানুষের এবং অন্য যে কোন প্রাণীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রীয়। কোন অবস্থায় চোখের যে কোন সমস্যা অবহেলা করা উচিত নয়। প্রতি বৎসর সারা বিশ্বে ২০ মিলিয়ন মানুষ অন্ধ হয়। এই ২০ মিলিয়নের মধ্যে আমেরিকায় ৫%, সাউথ আমেরিকা ও অফ্রিকায় ৬০% এর কাছাকাছি লোক অন্ধ হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ১ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১০-৪০ জন এবং উন্নত দেশে ১-৪ জন চোখের ছানির জন্য অন্ধ হয়। বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে মানুষ চোখের ছানিতে বেশী আক্রান্ত হয়। আমেরিকায় ৬৮% লোক আক্রান্ত হয় যাদের বয়স ৮০ বছরের উপর। বাংলাদেশে এই রোগের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে ভয়ে অথবা ঔদাসীন্নতার জন্য উপযুক্ত সময়ে ছানি বা ক্যাটারাক্ট অপারেশন করতে আগ্রহী নয়। এটা অতি সাধারণ অপারেশন। এই সমন্ধে কিছু জানা অজানা তথ্য তুলে ধরা হলঃ-

**১। ছানি বা ক্যাটারাক্ট কি?**

চোখের লেন্স তৈরি হয় প্রোটিন এবং জলীয় উপাদান দিয়ে। কিছু নির্দিষ্ট প্রোটিন লেন্সের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকে। বয়সজনিত বা অন্য কোনও কারণে, লেন্সের প্রোটিন স্বচ্ছতা হারায়। একেই বলে ক্যাটারাক্ট বা ছানি। এ সময় দরকার পড়ে লেন্সের প্রতিস্থাপন। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। আমরা সবাই ক্যামেরা দেখেছি। সেই লেন্সের উপর ধুলো পড়ে গেলে ছবি ঝাপসা দেখায়। তাই লেন্স পরিষ্কার করতে হয় বা বদলাতে হয়। একইভাবে চোখে ছানি পড়লে ক্যাটারাক্ট সার্জারির সাহায্যে লেন্স বদলের দরকার পড়ে।

**২। ক্যাটারাক্টের লক্ষণ কি?**

ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ও ঘোলাটে হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে দূরের দৃষ্টি ঝাপসা হলেও কাছের দৃষ্টি ঠিক থাকে। একে বলে সেকেন্ড সাইট রঙিন বস্তুকে বিবর্ণ লাগে। রাতে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয়। দিনেরবেলা প্রখর রোদে দৃষ্টির সমস্যা হয়। ডাবল ভিশন বা একই জিনিসকে 'দুটি' দেখতে পান। আলোর চারধারে রঙধনুর মতো দেখায়। রোগিকে ঘনঘন চশমা বদলাতে হয়। ওষুধের প্রভাবেও চোখে ছানি পড়ে। দুর্ঘটনার কারণেও ছানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বয়সজনিত কারণে মানুষ ছানির সমস্যায় পড়েন বেশি।

**৩। কাদের ছানি হয়?**

ছানি যে কোনও বয়সে হতে পারে। এমনকি চোখে ছানি নিয়েও শিশু জন্মাতে পারে। এই ধরনের সমস্যাকে কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট বলা হয়। আবার অন্য রোগ, ওষুধের প্রভাবেও চোখে ছানি পড়ে। দুর্ঘটনার কারণেও ছানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বয়সজনিত কারণে মানুষ ছানির সমস্যায় পড়েন বেশি।

**৪। রোগ পরীক্ষা নিরীক্ষা বা টেস্ট কি?**

(ক) ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি টেষ্ট: রোগির চোখের দৃষ্টির পরিমাপ করা হয়। (খ) টনোমেট্রি: চোখের ফ্লুইডে চাপ নির্ণয় করা যায়। (গ) পিউপিল ডায়ালেশন: চোখে বিশেষ ড্রপ দিয়ে পিউপিলের আকার বাড়ানো হয়। এতে চোখে ক্যাটারাক্ট ছাড়াও অন্য সমস্যা থাকলেও তা ধরা পড়ে।

**৫। চিকিৎসা কী?**

: সার্জারিই একমাত্র পথ। ছানি অপারেশন বা ফেকো সার্জারিতে একফোঁটা রক্তপাতও হয় না। অপারেশনের মধ্যে সবচাইতে চালু পদ্ধতি হল "ফেকোএমালসিফিকেশন"।

(ক) ফেকোএমালসিফিকেশন: অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ দিয়ে চোখের কর্নিয়ার কাছে খুব সুক্ষ্ণ ছিদ্র (২ মি.মি) করা হয়। এতে একবিন্দু রক্তপাত হয় না। এমনকী পরে সেলাইয়েরও দরকার পড়ে না। অতি পাতলা এবং সরু যন্ত্র বা প্রোব সেই ছিদ্রে প্রবেশ করানো হয়। শব্দ কম্পন দ্বারা 'কঠিন' হয়ে যাওয়া ছানি ভাঙা হয়। ভেঙে যাওয়া বা গলে যাওয়া 'ছানি' অংশটিকে ওই একই আলট্রাসাউন্ড প্রোব বা যন্ত্র দিয়ে টেনে নেওয়া হয়। এরপর পুরানো লেন্সের জায়গায় ইন্ট্রাঅকুলার বা আর্টিফিশিয়াল লেন্স লাগিয়ে দেওয়া হয়। রোগিকে অপারেশনের দিনেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে সাতদিন সাবধানে থাকতে হয়।

(খ) এক্সট্রা ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট সার্জারি: সাধারণ ফেকোএমলসিফিকেশন দ্বারা ক্যাটারাক্ট সার্জারি করা না গেলে যে পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়, তাকে বলে একস্ট্রাক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট সার্জারি। এই পদ্ধতিতে চোখে বড় অপারেশনের দরকার হয়। প্রায় ৫ মি.মি ছিদ্র করা হয়। সম্পূর্ণ ছানিই পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর একই পদ্ধতিতে চোখে কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া হয়। রোগীকে বিশ্রামে থাকতে হয় এক মাস।

**৬। সাবধানতা কি?**

কৃত্রিম লেন্সে দৃষ্টিসমস্যা হয় না। লেন্স তিন ধরনের: (১) মোনোফোকাল লেন্স (২) টোরিক লেন্স (৩) মাল্টিফোকাল লেন্স। সার্জারির পর ৫-৭ দিন কালো চশমা ব্যবহার করলে ভালো। অপারেশনের পরে কয়েকদিন চোখে পানি লাগাবেন না।। ক্যাটারাক্ট সার্জারির পর চশমার প্রয়োজনীয়তা কমে।

কৃতজ্ঞাতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ (তথ্য সূত্র)

১. ইন্টারনেট
২. শরীর ও স্বাস্থ্য (বর্তমান প্রকাশনা, ১৫ মে ২০১৮)
৩. ডাঃ আর সি পাল (সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার)
৪. সুপ্রিয় নায়েক
৫. দিপালী ও সুজিত সরকার (দমদম)॥

প্রবন্ধ

কালের সাক্ষ্য : পর্ব ৩১

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

# খ্রিস্টমণ্ডলীতে পিতৃগণের শিক্ষা

খ্রিস্টমণ্ডলী প্রেরণধর্মী। দীক্ষার গুণে সকল খ্রিস্টভক্ত বাণী প্রচার করতে ও বাণীর আলোকে জীবনযাপন করতে আহুত। খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের যাত্রা পথে বাণী হলো শক্তি, নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা। যুগে যুগে বহু সাধু সন্তগণ বাণীর আলোতেই জীবনযাপন করেছেন এবং তাদের চিন্তা চেতনা ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে আলোকিত করেছেন। তাদের মধ্যে মণ্ডলীর পিতৃগণ অন্যতম। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের বিশেষ এক অধ্যায় হলো 'পিতৃগণের শিক্ষা ও পরিচয়'। পিতৃগণের সময়-কাল হলো আদি মণ্ডলী থেকে ৬০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যা খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে 'স্বর্ণ যুগ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। পিতৃগণের শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পবিত্র বাইবেল, মণ্ডলীর চিরাচরিত শিক্ষা ও প্রেরিতের ঐহিত্য। মণ্ডলীর শিক্ষা এক, দীক্ষা এক, ঐতিহ্য এবং প্রথাও এক। সর্বজনীন মণ্ডলীর যাবতীয় শিক্ষার মধ্যে এক রুপ বিষয়টি অন্যতম। বিশ্বজনীন মণ্ডলীর ভাষা, সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরনের কিন্তু খ্রিস্টীয় শিক্ষা-নীতি ও নৈতিকতা সর্বদাই একই। পিতৃগণের জীবনাদর্শ ও শিক্ষার মধ্যে বাইবেলের শিক্ষাটি বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে।

গ্রীক শব্দ 'Pater' থেকে ইংরেজী 'Father' শব্দটি উৎপত্তি। বাংলায় 'পিতা' শব্দটি দিয়ে বহু অর্থ প্রকাশ করে। পিতা হলেন জন্মদাতা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, গঠনদাতা, শিক্ষাদাতা বা শিক্ষাগুরু ইত্যাদি। একজন পিতা শিক্ষক, গুরু, কর্তা, অভয়দাতা, শিক্ষাদাতা ও জীবনদাতা হিসাবে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে পিতা সর্বদাই শ্রদ্ধেয়, পূজিত, সম্মানিত ও দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি। পিতার আশ্রয়ে সন্তান ও পরিবার নিরাপদে থাকে। পিতা পরিবারের কর্তা, ছায়াদানকারী, রক্ষক, স্নেহশীল ও অভয়দাতা ইত্যাদি। গ্রীক শব্দ মিশে Patrology শব্দটি উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ হলো 'মণ্ডলীর পিতৃগণের শিক্ষা'।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রায় ১০০ জনের মতো 'পিতা' রয়েছেন। পিতৃগণের সময়-কাল Patristic Period' নামে খ্যাত এবং তাদের লিখিত বই পুস্তক, ব্যাখ্যা চিঠিপত্র Patrology নামে পরিচিত। 'পিতাগণ' প্রথমত গ্রীক ভাষায় লিখতেন কেননা আদি যুগে গ্রীক ভাষাটি বুদ্ধি জীবীদের ভাষা হিসেবে পরিগণিত হত। রোমীয় সাম্রাজের বৃদ্ধি লাভ ও আদি পত্যের সাথে সাথে ল্যাটিন ভাষাটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। তাই দেখা যায় ল্যাটিন ভাষায় ও পিতৃগণের চিন্তা চেতনা ও শিক্ষাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়।

পিতৃগণের লেখা বই, ধর্মোপদেশ ও পত্রের সংখ্যা হাজার হাজার। তবে অনেক গুলো লেখা ও বইয়ের কোন হদিস মিলে না। লেরিন্সের সাধু ভিনসেন্ট (৪৫০) বলেন, পিতৃগণ হলেন: (ক) খ্রিস্টীয় সত্য ও সঠিক শিক্ষা প্রচার ও রক্ষাকারী ব্যক্তি (খ) তাঁরা হলেন খ্রিস্টীয় জীবনাদর্শ ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত (গ) খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর শিক্ষার ধারক, রক্ষক, বাহক ও প্রাচীন-তত্ত্ব রক্ষাকারী এবং (ঘ) তাঁদের শিক্ষা সর্বদাই খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। মঙ্গলসমাচারে শুধু জীবন স্রটা ঈশ্বরকে পিতা বলা কথা বলা হয়েছে। তবে যিনি শিক্ষা দেন, শ্রদ্ধেয়, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তিনি পিতার সমতুল্য। পিতার কাছ থেকে পুত্র শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পিতার শিক্ষায় মধ্য দিয়ে পিতার মতো হয়ে উঠে। মণ্ডলীতে পিতৃগণ অনুকরণীয় আর্দশ ব্যক্তি এবং তাদের সৎ ও ধার্মিকতার জীবনার্দশ মণ্ডলী কর্তৃক সমাদৃত।

**পিতৃগণের লেখাসমূহ প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়**

ক) প্রৈরিতিক যুগ: প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী এবং শিষ্যদের পর যারা লেখা লেখিতে অবদান রেখেছেন।

খ) প্রমাণকারী পিতৃগণ: দ্বিতীয় শতাব্দীতে যারা ভ্রাতৃ মতামতের বিরুদ্ধে মতামত, বক্তব্য ও লেখনি মধ্যদিয়ে ডখ্রস্টমণ্ডলীকে রক্ষা করেছেন।

গ) গ্রীক ভাষা পিতৃগণ: চর্তুথ থেকে সপ্তম শতাব্দীর পর্যন্ত রোমীয় সাম্রাজের পূর্ব অঞ্চলের সাধু সন্ত ও লেখকগণ

ঘ) ল্যাটিন ভাষায় পিতৃগণ: চর্তুথ থেকে সপ্তম শতাব্দীর পর্যন্ত রোমীয় সাম্রাজের পশ্চিম অঞ্চলের সাধু সন্ত ও লেখকগণ।

জেজুইট ফাদার থমাস মিসেল তাঁর বক্তব্যের পিতৃগণ বিষয়ে বলেন, এটি "একটি ঐতিহাসিক যুগ যেটি খ্রিস্টান পন্ডিতদের মনোযোগ বিশেষভাবে আর্কষণ করেছিল তাহল মণ্ডলীর প্রথম পিতৃগণের যুগ। এ যুগ ছিল ২য়-৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। পিতৃগণের এই যুগের জন্য ঐশতত্ত্ব অধ্যয়নের এক বিশেষ ক্ষেত্র ছিল যাকে বলা হতো পিতৃগণের শিক্ষাতত্ত্ব অথবা খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণ, যার অর্থ "পিতৃগণের অধ্যয়ন।" পিতৃগণ ছিলেন খ্রিস্ট মণ্ডলীর প্রাথমিক চিন্তাবিদ ও ঐশতত্ত্ববিদ। পিতৃগণ বাইবেলীয় গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন, ভ্রান্তির বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় শিক্ষাকে রক্ষা করেছিলেন, বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও চলমান ঘটনাগুলিকে লিখে রেখেছিলেন এবং তাদের সময়কার ইহুদী এবং বিজাতীয় চিন্তার সঙ্গে ডখ্রস্টান শিক্ষার সর্ম্পক ঘটিয়েছিলেন।

পিতৃগণের লেখার প্রধান উৎস হলো 'পবিত্র বাইবেল'। মণ্ডলীর শিক্ষা বাইবেল, ঐতিহ্য ও নীতি-নৈতিকতার আলোকে তাদের জীবনসাধনা মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিত বইয়ে বলা হয়েছে, "মণ্ডলীর পিতৃগণ হলো মণ্ডলীর বিশিষ্ট সাক্ষী। অর্থাৎ তাদের মধ্যে খুজে পাই খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েকটি শতাব্দীতে কিভাবে মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা বাস্তব জীবনে রূপায়িত হয়েছে। এই কারণেই খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য যদিও কোন পিতৃর কাছ থেকে সঠিক অর্থাৎ সঠিক চিন্তা ধারা দাবী করে, সেই সঙ্গে দাবী করে পবিত্রতাও।" সুতরাং পিতৃগণের লেখা ও শিক্ষা মণ্ডলীর অন্যতম উৎস ও প্রেরণার আকর। এটা নিশ্চিত যে পিতৃগণের শিক্ষা ও লেখার আলোকে পরবর্তীতে ঐশতত্ত্ব ও মাণ্ডলীক শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে।

পিতৃগণের রচনা সম্ভার এমন একটি ভান্ডার, যা থেকেই সবাই কিছু কিছু নিলেও তা অফুরান থেকে যায়। ইহা এমন একটি ঝর্ণা, যা থেকে কিছু কিছু পান করলেও কখনও তা শুকিয়ে যাবে না, কেননা সেই ঝর্ণার উৎস হলেন স্বয়ং প্রভু যিশু। প্রভুর ক্ষত থেকে, সেই জল ও রক্তধারা (সাক্রামেন্ত/সংস্কার) থেকে জীবনের উৎপত্তি ও মণ্ডলীর জন্ম হয়েছে। সেই ঝর্ণা শাশ্বত, কারণ যিশুর যাতনাভোগ ও পুনরুত্থানের পরে পবিত্র আত্মার অবতরণ অর্থাৎ পঞ্চাশত্তমীর সেই দিনের পর থেকে আজ অবধি সেই প্রবহমান ও জীবনময় স্রোত চলে আসছে। যারা এই ঝর্ণা থেকে পান করে, তারা আর কোনদিন তৃষিত হবে না (যোহন ৪: ১৩)। [মঙ্গলসমাচারের পিতৃগণের ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১৯]

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পল লিখেছেন: "আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের নিকট যাওয়া আর খ্রিস্টধর্মের উৎসের দিকে ফিরে যাওয়া একই, কেননা এই পথ ছাড়া সেই দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার প্রত্যাশিত বাইবেল ও উপাসনাদির নবীকরণ ও বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বের নতুন রূপ দেওয়া সম্ভবপর নয়।" (মঙ্গলসমাচারের পিতৃগণের ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১৯-২০)

পিতৃগণ হলেন খ্রিস্টীয় জীবনের আর্দশ ও দৃষ্টান্ত। কেননা তাদের জীবন ছিল খ্রিস্টীর সত্যময় শিক্ষার পরিপূর্ণ পবিত্রতায় উজ্জ্বল এবং মণ্ডলীর কর্তৃক স্বীকৃত। পিতৃগণের শিক্ষা ও জীবন দৃষ্টান্তের উপরই পরবর্তী সন্ন্যাস জীবনে ভিত্তি ও ঐশতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সময়ের যাত্রাপথে পিতৃগণের শিক্ষা পুরানো মনে হয় কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তা চির নতুন। খ্রিস্টমণ্ডলীতে পিতৃগণ আমরণকাল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও শিক্ষক হয়ে আলোক রশ্মিতে মণ্ডলীকে জ্যোর্তিময় করে তুলবে॥

নিয়মিত কলাম

## সেদিনের গল্পকথা

হিউর্বাট অরুণ রোজারিও

# রোমান কলসিয়াম গৌরবের না নৃশংসতার

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্রদ্ধেয় ফাদার জন স্ট্যানলীর উৎসাহে আমরা ৬০জন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাঙালি খ্রিস্টানগণ তীর্থযাত্রী ইতালী ও ভাতিকান সফর করি। ফাদার স্টানলীর সাথে ভ্রমণ করা খুবই আনন্দদায়ক। আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে যায়, যেহেতু তিনি ইংরেজী, স্পেনিস, ইতালিয়ান ও জার্মান ভাষা বলতে পারেন। ইউরোপ, ভ্রমণের জন্য সেটা খুবই প্রয়োজনীয়। যেটা আমাদের বাড়তি পাওয়া। অনেক উৎসাহ, সংশয় ও উদ্দীপনা নিয়ে এক সকালে আমরা ডুবন্ত শহর ভেনিস বিমান বন্দরে অবতরণ করি। ভেনিস শহর পৃথিবীর মধ্যে অনন্য কারণ সেখানে কোন রাস্তাঘাট নেই সবই খাল বা ক্যানাল দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। আমরা তখন বাস বা কোচ দিয়ে অনেক ঐতিহাসিক শহর দেখতে দেখতে একদিন রোমে এসে পৌঁছি, সেখানেই পোপের ভাতিকান রাষ্ট্র। রোমে দেখার স্থান প্রচুর। তাই আমাদের প্রায় এক সপ্তাহ ইতালির রাজধানী ও রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান ও পোপের রাষ্ট্র ভাতিকান দেখতে দেখতে সফর শেষ হয়। অনেক স্থানে পবিত্র বাইবেল জীবন্ত হয়ে উঠে।

আমাদের হোটেলের পিছনেই ছিল রোমান ইতিহাসের বিখ্যাত কলসিয়াম। কলসিয়াম উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে ৭ হাজার প্রাণী ও গ্লাডিয়েটরের প্রাণ গিয়েছিল। সে দৃশ্যগুলো কতটা হৃদয় বিদারক ছিল, কতটা হিংস্র ছিল তা অনেকেই ইংরেজী হলিউডের অনেক চলচ্চিত্রে কিছুটা দেখেছেন। কলসিয়ামে গিয়ে দেখি হাজার হাজার পর্যটকের ভিড়। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে রোম সাম্রাজ্যের পুরাকীর্তি দেখতে এসেছেন। প্রায় তিন হাজার বৎসরের আগের কলসিয়াম দুটো বড় ভূমিকম্পন, অনেক যুদ্ধ দেখেছে। অনেক খানি ধ্বংস হয়ে গেছে তবুও পাথরের গড়া কলসিয়ামের এক তৃতীয়াংশ মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। সাক্ষ্য দিতে রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের এবং নৃশংসতার ইতিহাস।

কলসিয়ামের অন্দরে ঢুকতেই মনে হলো আমরা দু'হাজার বছরের পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছি। ছয় একর জমির উপর এটা নির্মিত, আধুনিক কালের বিশাল স্টেডিয়ামের মত। বিশেষত্ব হলো স্টেডিয়ামের মাঠের নীচেও আরও তিনতলা রয়েছে। সেখানে স্থান পেত সকল মল্লযুদ্ধারা বা গ্লাডিয়েটররা ও সব হিংস্র জন্তু, তারা উপরে উঠে লড়াই করত। লোকদের বসার গ্যালারি সহ এর উচ্চতা ৪৮ মিটার, দৈর্ঘ্য ১৮৮ মিটার চওড়া ১৫৬ মিটার। তিন লেভেলের ২৪টি আর্চ রয়েছে। সমস্ত কলসিয়াম দামী পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। ৫০হাজার লোক এক সাথে গ্লাডিয়েটরদের যুদ্ধ দেখতে পেত। রোম সাম্রাজ্যের সব নাগরিকরা বিনামূল্যে সেখানে প্রবেশ করতে পারত। এটা প্রথমে এম্পি থিয়েটার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কলসিয়ামের ভূগর্ভস্থ তলায় হাইপোজিয়াম রয়েছে। নীচে বড় বড় সব খাঁচায় থাকত হিংস্র সব প্রাণী ও গ্লাডিয়ারগণ। সেই প্রাচীন যুগে, দর্শকদের জন্য ঠাণ্ডা বাতাস সরবরাহের জন্য "ভেলেরিয়াম" নামে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শীতল বাতাস কলসিয়ামের গ্যালারিতে ঢুকতে বিশাল পাখা দড়ি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। দুই হাজার বছর আগের নির্মিত এ ব্যবস্থায় রয়েছে নিপুণতা এবং দক্ষ প্রকৌশলীদের অভিনব মেধা। প্রথমে কলসিয়ামের নাট্যশালায় নাটক ও অপেরা প্রদর্শিত হতো। ৯২ খ্রিস্টাব্দে ফেরিয়াস বংশের সম্রাট ভেসনরিয়ান এটি নির্মাণ করেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর তার পুত্র সম্রাট টাইটাস নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেন এবং সাঁতার প্রতিযোগীতার জন্য বিশাল পুলের ব্যবস্থা করেন। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে ইহুদী বিদ্রোহের পরে পরাজিত দাসদের দিয়ে এই কলসিয়াম নির্মিত হয়।

কলসিয়ামে নিয়মিত পশুর লড়াই, পশু ও মানুষের লড়াই হতো, পশুদের মৃত্যু দেখতে দেখতে সম্রাট টাইটাস এক ঘেয়েমি বোধ করেন। তিনি শুরু করেন মানুষে মানুষে লড়াই, মানুষে পশুর লড়াই, যা ছিল জীবন মরণ লড়াই। পরাজিতদের নিষ্ঠুর, করুণ বিভৎস কাহিনী। এই মল্লযুদ্ধ নিয়েই শুরু হয়েছিল গ্লাডিয়েটরদের খেলা। এই যুদ্ধে একজন গ্লাডিয়েরকে আঘাত করতে করতে মারা হতো। খেলা চলত যতক্ষণ না একজনের পরাজয়ে মৃত্যু হতো। লড়াই চলাকালে কোন একজন গ্লাডিয়টর যখম হলে রক্তপাত হলে সকল দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ত। অনেক সময় আহত রক্তাক্ত পরাজিত গ্লাডিয়েটর সম্রাটের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইত। সে ক্ষমা নির্ভর করত সম্রাটের মেজাজের উপর। সম্রাট বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে পরাজিত গ্লাডিয়েটরকে শেষ করার ইশারা দিতেই রোমবাসীরা আনন্দে উল্লাসে "হেইল সিজার" ধ্বনিতে রোমের আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিত।

এই কলসিয়ামে বসে রোম সাম্রাজ্যের দুধর্ষ সম্রাট জুলিয়াস সিজার তিনশত গ্লাডিয়াটরদের লড়াই উপভোগ করেছেন। সম্রাট ট্রাজোন উপভোগ করেন পাঁচ হাজার দ্বৈত লড়াই। নিষ্ঠুর রোমীয় সম্রাট নিরো নব দীক্ষিত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের কলসিয়ামে এনে ক্ষুধার্ত ও হিংস্র জানোয়ারের সামনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার আনন্দে বিভোর থাকতেন। মণ্ডলীর ইতিহাসে খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ লোকদের ধর্মশহীদের আত্মত্যাগ ও কাথলিক মণ্ডলীকে ধ্বংস করার জন্য রোমীয় শাসকদের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের অমানুষিক অত্যাচারে খ্রিস্টধর্ম আরও উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় হয়েছে, কারণ খ্রিস্টমণ্ডলী কোন মানুষ দিয়ে পরিচালিত নয়, স্বয়ং ঈশ্বরই মণ্ডলীকে সংরক্ষিত করে ও পরিচালিত করেন।

রোম সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়েছিল প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। রোমীয় শাসকদের ছায়াতলে বিকশিত হয়েছিল অপূর্ব সব স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা ও ল্যাটিন সাহিত্য ও আইন শাস্ত্র। সম্রাট নিরো যেমন ছিলেন দুশ্চরিত্র, তেমনি ছিলেন নিষ্ঠুর। তিনি তার জননীকে হত্যা করেন। তিনি রোমকে পুর্ণগঠিত করার জন্য পুরাতন জীর্ণ শহর গুলিকে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। যখন তিনি দেখলেন যে নগরীর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জন্য তারই উপর দোষারোপ করা হচ্ছে তখন তিনি জানালেন খ্রিস্টানরাই এই অগ্নিকাণ্ডের হোতা। তাই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটনের জন্য সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। সম্রাটের হুকুমে নির্দোষ খ্রিস্টানদের যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুর মুখে হিংস্র পশুদের দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ৬৭ খ্রিস্টাব্দে রোমনগরে প্রভু যিশুর বাণীর প্রচারের অক্লান্ত উদ্যোগী সাধু পিতর ও সাধু পলকে হত্যা করা হয়। শিষ্যবর পিতর ও পলের মৃত্যু বরণের মাত্র এক বৎসর পর নিজের তরবারি দ্বারা নিরো নিজ মস্তক ছেদন করে মৃত্যুবরণ করে সেটা ছিল ৬৮ খ্রিস্টাব্দ, খ্রিস্ট বাণী রোমে মুক্তি পায়। নব দীক্ষিত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে। রোমের ধর্ম শহীদদের পবিত্র রক্তে সিক্ত হয়ে খ্রিস্ট মণ্ডলী সারা বিশ্বে শোভিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত রক্তপাত হয়েছে তার চেয়ে বেশী রক্ত ঝড়েছে রোমের কলসিয়ামে যা এখন বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি; পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ট্যুরিষ্ট স্পট॥

# বড়দিন-বড় হবার দিন

**ফাদার আবেল বি রোজারিও**

২৫ ডিসেম্বর, যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব। সময়ের দিক দিয়ে দিনটা ছোট, কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে, তাৎপর্যের দিক দিয়ে দিনটা বড়। আরও এক অর্থে দিনটা বড়, তা হলো এই জন্মোৎসব আমাদের আহ্বান করে বড় হতে, মহৎ হতে।

কিভাবে বড় হবো, সেই উপায়ও যিশু দেখিয়েছেন তাঁর জন্ম, তাঁর জীবনদান ও প্রচারের মাধ্যমে। সেই পথ হলো নম্রতা, সরলতা ও নিজেকে ছোট ভাবার আদর্শ। প্রভু যিশু রাজাধিরাজ হয়েও নিজেকে নম্র করলেন, এক গোয়ালঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। ভেটুর গ্রামে এক পরিবারে দু ভাই, অরিণ (৩য় শ্রেণি) ও জেরিন (১ম শ্রেণি) এক রাতে মালা প্রার্থনার পর মা বললেন, যিশুর মা বাবা এতো গরীব ছিলেন যে একটা ঘরও খুঁজে পাননি। তাই যিশু জন্ম নিলেন এক গোয়াল ঘরে।

অরিণ বললো- মা গোয়ালঘর কি?

মা- আমাদের গরুগুলো যে ঘরে থাকে ওটাই গোয়ালঘর।

অরিণ- মা, উনারা যদি আমাদের বাড়িতে আসতো, তুমি কি একটা ঘর ছেড়ে দিতে না?

শিশু যিশুর প্রতি অরিণের কত দরদ, মায়া মমতা। যেহেতু যিশু নিজেকে অতিশয় নম্র করলেন, তাই ঈশ্বর তাকে অনেক উন্নীত করলেন "যিশু স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন, দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন..... তাই ঈশ্বর তাঁকে সবার উপরে উন্নীত করলেন *(ফিলিপিয় ২:৫)*" কবির কবিতায় "আপনাকে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যাকে বড় বলে বড় সে হয়।" কবিতার শেষাংশে "বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।" প্রভু যিশু তাঁর প্রচার মাধ্যমে এই সাক্ষ্যই বার বার প্রকাশ করেছেন যে যারা শিশুদের মত নিজেদের ছোট করে, নম্র করে, স্বর্গরাজ্যে তারাই সবার বড়। 'কে বড়' এই নিয়ে একবার শিষ্যদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। যিশু তখন তাদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে ছোট, সেই তো সবচেয়ে বড়। *(লুক ৯:৪৮)* বাণী প্রচারের সময় যিশু বার বার শিশুদের নম্রতা শিশুদের সরলতা তুলে ধরেছেন *(মথি ১৮:১-৫; লুক ৯:৪৬; মার্ক* ৯:৩৩-৩৫)।

ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা নিজেকে এত ক্ষুদ্র, এত নম্র করেছেন যে মাতামণ্ডলী তাঁকে অনেক উন্নীত করেছেন, তাঁকে ৩টা সম্মাননা দিয়েছেন, ১ম-তাকে সাধ্বী বলে ঘোষণা দিয়েছেন; ২য়-তাকে মিশনারীদের প্রতিপালিকা ঘোষণা দিয়েছেন; ৩য়-তাকে আচার্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বাস্তব জীবনেও আমরা লক্ষ্য করি, যে ব্যক্তি নিজেকে নম্র করে মানুষ তাকে বেশী শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। অপর দিকে আমরা দেখি এক ব্যক্তি খুবই সম্পদশালী, খুবই শিক্ষিত, খুবই উচ্চ পদধারী কিন্তু সে তার ধনসম্পদের জন্য, বিদ্যার জন্য, উচ্চপদের জন্য অত্যন্ত গর্বিত, অহংকারী এরূপ ব্যক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করবে না, ভালবাসবে না। পক্ষান্তরে আমরা যদি তাকাই ঈশ্বরের সেবক টিএ গাঙ্গুলীর দিকে, তাহলে আমরা কি দেখি? আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী খুবই শিক্ষিত (বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রথম পিএইচডি প্রাপ্ত ব্যক্তি), নটরডেম কলেজের প্রথম বাঙালি প্রিন্সিপাল, প্রথম বাঙালি বিশপ/আর্চবিশপ ছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন কত সহজ-সরল, নম্র-ভদ্র ব্যক্তি। একদিন তিনি বান্দুরায় আসলেন। তিনি দেখতে পেলেন প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নকালে তার প্রধান শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে এসে বৃদ্ধ শিক্ষকের পদধূলি নিয়ে বললেন, "স্যার আমি আপনার সেই তেদন (আর্চবিশপের বাড়ীতে দেওয়া নাম)। বৃদ্ধ শিক্ষক তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন,"আমার সেই আদরের তেদন এখন কত বড় হয়েছে।" এরূপ আরও কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

তা হলে বড়দিন, খ্রিস্টপ্রভুর জন্ম তিথি আমাদের জন্য কি বার্তা বয়ে আনে? বড় হবার বার্তা। সরল, নম্র, ছোট হওয়ার মাধ্যমেই আমরা বড় হতে পারবো॥ ৯০

## "তুমি এলে"

সুশীল মন্ডল

তুমি এলে ধরাতলে,
ধরে মানুষ বেশ,
তোমাকে যেন চিনতে পারে
ফেলে দু:খ-ক্লেশ।
তুমি এলে গোয়াল ঘরে
দান করলে তোমাকে,
মানুষের মাঝে যেন তুমি
মিলাতে পার নিজেকে।

# বড়দিনের উপহার

**সাগর জে তপ্ন**

নতুন মিশন। আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে যেখানে অনেক পরিবারই আগে থেকে খ্রিস্টান হিসেবে জীবন যাপন করে আসছে। তবে মিশন পাড়ায় এখনো কয়েকটি অখ্রিস্টান পরিবার রয়েছে। যদিও মিশনের ফাদার-সিস্টারগণ প্রতিনিয়তই গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে যান তবু সেই অখ্রিস্টান পরিবারের লোকজন খ্রিস্টধর্মের প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ বোধ করে না। মিশন ও খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাদের তেমন কোন মন্দ মনোভাব প্রকাশ পায়না। তবে তাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হল রমেশ। সেই একমাত্র মানুষ যে ফাদার-সিস্টারদের অযথা সমালোচনা করে, গালিগালাজ করে। কোন এক তুচ্ছ ঘটনায় তার এমন বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। রমেশের পিতা-মাতা মারা গেছেন দশ বছর আগে। রমেশের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ হবে। খেটে খাওয়া মানুষ। বয়স বোঝার কোন উপায় নেই। তাছাড়া নানা ধরণের অসুখ-বিসুখ তো প্রতিনিয়ত তার সঙ্গী। দেরি করে বিয়ে করেছে আবার দেরি করেও সন্তান এসেছে তাদের পরিবারে। তার বউ গরীব ঘরের মেয়ে। তাদের একমাত্র মেয়ে রেশমী। বয়স সাত। সুন্দর চেহারা। মিষ্টি করে হাসতে পারে। কথাও বলে সুন্দর গুছিয়ে। আসলে বাড়ির ভিটে ছাড়া কোন জমি-জমা নেই রমেশের। তাই কোন এক সংস্থা থেকে একটি ভ্যান পেয়েছিলো গতবছর। কিন্তু সেই ভ্যানটি তার কাল হলো। একদিন সন্ধ্যায় ভ্যানে করে মানুষ নিয়ে আসছিল রমেশ। অন্ধকারে রাস্তার বাঁকে ঘুরতে গিয়ে কি যেন হল; রাস্তা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল ভ্যান সহ ভ্যানের সব মানুষ। অন্যদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি তবে রমেশের ডান-পা-টা ভেঙ্গে গেল। এই ঘটনায় মিশনের ফাদার রমেশকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু ফাদারের সাথে মনোমালিন্য থাকার কারণে ফাদারের কাছ থেকে কিছুই নিতে চাইলো না। স্বামীর পা ভাঙ্গার পর অনেক কষ্টে তার স্ত্রী রিশি পরিবার চালাচ্ছে। বাড়িতে দু'মুঠো ভাত রান্না করার জন্য রিশিকে সারাদিন অন্যের ক্ষেতে কাজ করতে হয়। বাড়িতে রমেশ তার ভাঙ্গা পা নিয়ে সারাদিন বসে থাকে। মেয়ে মিশন স্কুলে পড়ে। যদিও তারা অখ্রিস্টান তবু প্রতিদিন সকালে রেশমী তার সহপাঠিদের সাথে গির্জায় যায়। যদিও রেশমীর গির্জা যাওয়ার বিষয় নিয়ে রমেশ আপত্তি করেছিল কিন্তু স্ত্রী রিশির কারণে সে কিছু করতে পারেনি। রিশি বলে তোমার সাথে ফাদারের দ্বন্দ রয়েছে; রেশমীর সাথে তো নেই। আর গির্জায় গেলে ছোট মেয়ের তেমন কিছু হয়না। অন্য অখ্রিস্টান ছেলেমেয়েরাও তো গির্জায় যায়। আর তাছাড়া সে তো মিশন স্কুলেই পড়ে। গির্জায় গিয়ে যে সে খ্রিস্টান হবে এমন তো নয়। আর প্রতিদিন গির্জায় গিয়ে সে তো অনেক গান, নাচ শিখছে। রিশির এই কথার জোরেই রমেশ রেশমিকে গির্জায় যেতে নিষেধ করেনা। ছোট মেয়ে। গির্জায় গেলে তো বেশি ক্ষতি হবেনা। আর তারা তো জোর করে কাউকে খ্রিস্টানও বানায়না।

গির্জায় গিয়ে রেশমী আসলেই অনেক কিছু শিখছে। অন্যান্য খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের মতোই সে শিশুমঙ্গলে যায়। শিখে কেমন করে ক্রুশের চিহ্ন করতে হয়। প্রার্থনার সময় দুষ্টামি করতে হয়না ইত্যাদি। ফাদারের উপদেশে সে অন্যকে সাহায্য করার কথা শুনে। গরীব-দুঃখী সবাইকেই সাহায্য করতে হবে। রেশমী বুঝেনা তারা গরীব কি ধনী। তবে যখনই সে খাবার খেতে চায় তার মা তাকে খেতে দেয়। তাদের গ্রামে প্রায়ই এক বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। রেশমী তাকে দাদু বলে ডাকে। যখই সে ভিক্ষা করতে তাদের গ্রামে আসে সে রেশমীদের বাড়িতে বসে অনেকক্ষণ কাটায়। তাদের বাড়িতে এসে সে পানি খেতে চায়, খাবার খেতে চায়। বৃদ্ধটির বাড়ি কোথায় তা রেশমী জানেনা। হয়তো বা শুনেছে কিন্তু মনে রাখতে পারেনি। তবে এটা রেশমীর মনে থাকে যে শুক্রবার দিন ঐ দাদুটি আসবে তাদের গ্রামে। তাদের বাড়িতে। তাই বৃদ্ধ ভিক্ষুক দাদুর জন্য সে তার রুটির অর্ধেকটা রেখে দেয়। বৃদ্ধ ভিক্ষুক তাদের বাড়ি আসলে সে তাকে খেতে দেয়। রেশমীর মা-বাবা তাতে তেমন আপত্তি করে না। রেশমী দেখে বৃদ্ধ ভিক্ষুক দাদু গ্রামে ভিক্ষা করতে আসলে অনেকে কিছু দেয়; আবার অনেকেই দেয় না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকে যা দেয় তাই খুশি মনে গ্রহণ করে। যারা দেয় না তাদের প্রতি তার কোন ধরণের বিরক্তির ভাব দেখা যায় না তার মুখে। বলতে গেলে প্রত্যেক সপ্তাহেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক রেশমীদের গ্রামে আসে।

শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। প্রচণ্ড শীতেও একটা লাঠি হাতে বৃদ্ধ ভিক্ষুক ঠুক ঠুক করে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে আর খক্ খক্ করে কাশে। একদিন রেশমীদের বাড়িতে ঢুকতেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক শুনতে পায় রমেশ ও রিশির কথপোকথন। রিশি বলে, সামনে বড়দিন, গ্রামে ছেলেমেয়েরা সবাই নতুন জামাকাপড় পড়বে। এখন রেশমীও নতুন কাপড় পড়ার আবদার করছে। এমনিতে যে অবস্থা। প্রতিদিনের ভাতই জোটাতে পারি না। আবার নতুন জামা কাপড়। রমেশ বিরক্তিতে মুখ ভার করে বলে, বাদ দাও তো। রেশমীকে বড়দিনে গির্জায় যেতে দিওনা। তাহলেই তো হলো। তা না হয় হলো। কিন্তু গ্রামে যে ছেলেমেয়েরা নতুন জামাকাপড় পড়ে ঘুরবে তখন তার কেমন লাগবে। তোমার-আমারই বা কেমন লাগবে। তুমি তো ফাদারের কাছ কোন সাহায্যই নিলেনা। তাহলে আর আমাকে এতো কষ্ট করতে হতো না। তাদের এই কথাবার্তা শুনে বৃদ্ধ ভিক্ষুক তাদের বাড়িতে না ঢুকেই ফিরে গেল। বেশ কয়েকদিন আর তাকে এই গ্রামে ভিক্ষা করতে দেখা গেলনা। গ্রামের অন্য লোকদের মতোই রমেশ ও রিশিরও ধারণা বৃদ্ধ ভিক্ষুক মনে হয় মারা গেছে।

২৪ ডিসেম্বর। চারদিকে বড়দিনের শেষ প্রস্তুতি চলছে। আজ রিশি কাজ করতে মাঠে যায়নি। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বসে আছে চুপচাপ। বাইরে রেশমী ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করছে। হঠাৎ রেশমী ও অন্য ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে ফাদার রমেশের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাড়িতে ঢুকে পড়েন। ফাদারের কণ্ঠস্বর শুনে রিশি ব্যস্ত হয়ে পড়লো ফাদারকে কোথায় বসতে দিবে বলে। বিছানায় শুয়ে থাকা রমেশ অন্যপাশে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফাদারের হাতে একটি ব্যাগ। ফাদার প্রশ্ন করেন, কেমন আছো রমেশ? প্রশ্নটা রমেশকে; কিন্তু উত্তর দেয় রিশি, 'আছি ফাদার এই যে এক রকম। আর রেশমির বাবার এই অবস্থা।' ফাদার রমেশের কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলতে থাকেন। ফাদার জিজ্ঞেসা করেন আমার হাতে কি আছে বলতো? রিশি উত্তর দেয়, দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যাগ কিন্তু ভিতরে কি আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাগ থেকে একটা সুন্দর জামা বের করে আনেন ফাদার। এটা হলো রেশমীর বড়দিনের জামা। সুন্দর না? জামা হাতে নিয়ে রিশির চোখে জল আসে। ফাদার বলেন, মনে করো না যে আমি এটা দিয়েছি। আর আমি দিলেও তো রমেশ নিতে চাইবে না জানি। এটা দিয়েছেন এই রেশমীর সেই দাদুটি। যিনি গ্রামে ভিক্ষা করতে আসেন। রিশি আর রমেশের যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। কি করে সম্ভব! ফাদার ব্যাগটা রমেশের হাতে দিয়ে বলেন আর এই ব্যাগে যেটা আছে এটা তোমাদের জন্য। যেন ভালমতো বড়দিন করতে পারো। আর তোমার যেন চিকিৎসা হয়। ব্যাগটা হাতে নিয়ে রমেশ দেখে তাতে টাকা রয়েছে। এতে বিশ হাজার টাকা রয়েছে। সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটির সংগ্রহ করা টাকা। ফাদার সংক্ষেপে তাদের জানান যে সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি গতকাল সন্ধ্যায় এই সুন্দর জামা আর টাকা নিয়ে ফাদারের কাছে আসেন। বুঝলে রমেশ সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি শুধু ভিক্ষা করতেই এই গ্রামে আসতেন না। তোমার মেয়ের জন্য আসতেন। তোমার মেয়ে তাকে দাদু ডাকতো। আর তাকে খেতে দিতো। আর সত্যি সত্যিই সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি তোমার মেয়েকে নিজের নাতনির মতোই আদর করতেন। দেখেছ, তোমার মেয়ের ছোট ছোট দয়ার কাজ আজ কত বড় হয়েছে। তাই তোমাদের এই অভাব-বিপদের দিনে তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন।

ফাদারের কথা শুনতে শুনতে রমেশ আর রিশির চোখ জলে ভরে গেল। পাশ ফিরে রমেশ ফাদারের হাত ধরে সত্যিই কেঁদে ফেললো। রমেশ বলে, 'ফাদার, আমি অনেক পাপ করেছি, অনেক অপরাধ করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার অনেক সমালোচনা করেছি। আপনার বিরুদ্ধে কথা বলেছি। আমি আর কখনো এমনটা করবো না।' রমেশের চোখে অনুতাপের জল। অন্যদিকে রিশির চোখে আনন্দ অশ্রু। এতোদিন পরে তার স্বামী মন পরিবর্তন করলো। রমেশের মাথায় হাত বুলিয়ে ফাদার বলেন, বুঝলে রমেশ, ঈশ্বর আমাদের সবাইকেই ভালবাসেন। শুধু আমাদের প্রয়োজন মন পরিবর্তন করে তাঁর কাছে ফিরে আসা। আর আজ তো বড়দিন। আমাদের প্রভু যিশুর জন্মদিন। যিশু খ্রিস্টান-অখ্রিস্টান সবার জন্য, পৃথিবীর সব জাতির জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বড়দিন শুধুমাত্র খ্রিস্টানদেরই উৎসব নয়। বড়দিন সবার জন্য। সবার উৎসবের দিন। আর এই যে জামা আর টাকা তোমাদের জন্য বৃদ্ধ ভিক্ষুক দাদু দিলেন তা হলো তোমাদের এই বড়দিনের উপহার। তো রমেশ তোমার মেয়ে রেশমীকে আজ রাতে বড়দিনের মিশায় যেতে দিবেনা? হ্যাঁ ফাদার, অবশ্যই আজ তাকে নতুন জামা পরিয়ে গির্জায় পাঠাবো। আর তার মা রিশিকে পাঠাবো। আমি যেতাম যদি পা-টা ঠিক থাকতো। রমেশের কথা শুনে ফাদার মনে একটা শান্তি পেলেন। সত্যিই রমেশ আজ এই বাড়িতে যিশু জন্মগ্রহণ করেছেন। তাহলে আজ রাতে গির্জায় দেখা হবে। আমি তবে চলি..। অনেক ধন্যবাদ ফাদার..একসাথে রমেশ আর রিশি ফাদারকে ধন্যবাদ জানায়। সত্যিই আজ রমেশের বাড়িতে বড়দিনের উপহার হল রেশমির নতুন জামা আর রিশি ও রমেশের জন্য বিশ হাজার টাকা। আর ফাদারের জন্য বড়দিনের উপহার হলো রমেশের মন পরিবর্তন। সবই সেই রেশমি আর বৃদ্ধ ভিক্ষুক দাদুটির জন্য॥

মেঘা মারীয়া কস্তা
হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুল
৪র্থ শ্রেণি

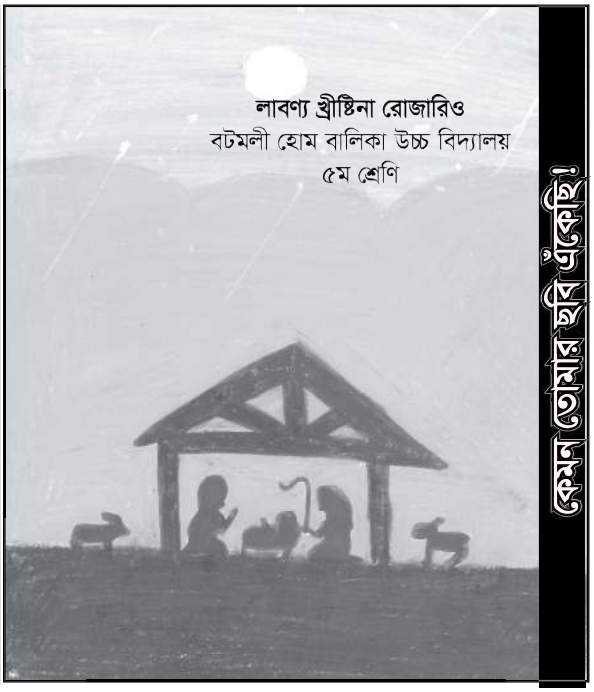


লাবণ্য খ্রীষ্টিনা রোজারিও
বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৫ম শ্রেণি